দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে চিরায়ত তথা মধ্যযুগীয় উপাদানের নবরূপায়ণ

আধুনিক জগতের মানুষের সকল আশা আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সামাজিক অবস্থা-বৈষম্য ইত্যাদির সাহিত্যরূপ হল কথাসাহিত্য। এই কথা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধারা হল উপন্যাস। উপন্যাসের মধ্য দিয়েই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের জনজীবনের বিচিত্র রূপ তুলে ধরা হয়। ঔপন্যাসিক সার্থক স্রষ্টার মতো মানব জীবনের বিচিত্ররূপকে তাঁর লেখনীর স্পর্শে জীবন্ত করে তোলেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন– *"উপন্যাসের রচয়িতা এ যুগের সাহিত্য বিধাতা। তিনি বিধাতার মতোই শক্তিমান, সবর্গ , সর্ব্যাপ্ত, সর্বজ্ঞ। এ যুগের মানুষের চিন্তা ও অনুভূতির সকল প্রদেশে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। উপন্যাস এ শিল্প বিধাতার যোগ্যতম বাহন।''* [১]

ঔপন্যাসিক জীবনশিল্পী অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কেননা, তিনি জীবনের রূপ, রস, অর্থ ও নবতর ব্যঞ্জনার খোঁজ করে চলেন, এর মধ্য দিয়েই তিনি জীবনের রূপকার ও ভাষ্যকার হয়ে ওঠেন। ফলে ঔপন্যাসিকের জীবন জিজ্ঞাসা একদিকে যেমন বিশ্বমানবের আত্ম সন্ধান তেমনি অন্যদিকে লেখকেরও আত্মাবিষ্কার।

উপন্যাসে লেখক তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন ঘটনা, বিশ্বাস, রীতি-নীতি, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির পরিচয় তুলে ধরেন তাঁর লেখনীর স্পর্শে। অর্থাৎ সময়ই হয়ে ওঠে উপন্যাসের আধার। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ থেকে মধ্য যুগ এবং পরবর্তী সময় অর্থাৎ আধুনিক যুগেও জন-জীবনের বিচিত্র পরিচয়ে তাদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে রচিত হয়েছে সাহিত্য। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই

লেখক সেই সময়ের ঘটনা, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির চিত্রকে তুলে ধরেন। ফলে কোনও সাহিত্যই সময়কে উপেক্ষা করে রচিত হতে পারে না। সময়ের কাছে দায়বদ্ধ বলেই লেখকের কলমে উঠে আসে সময়ের কথা। আর সময়কে আধার ও আধেয় করেই প্রত্যেক লেখকই তাদের আখ্যানের বাস্তব রূপ ও কাঠামো তৈরি করে নেন। তাই আখ্যান রচনা করতে গিয়ে সময়, সমাজ, ইতিহাস ও ব্যক্তি-মানুষ অপরিহার্য হয়ে পড়ে— *"... মানুষকে খুঁজতে গিয়ে এই সমাজ, সময় আর ইতিহাসকেও খুঁজতে হয়। সমাজ, সময় আর ইতিহাসধৃত ব্যক্তি মানুষ হচ্ছে উপন্যাসের অন্বিষ্ট।''* [২]

অর্থাৎ মানুষকে খুঁজতে গিয়ে সময় সমাজ ও ইতিহাস মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সময়, সমাজ, ইতিহাস ও ব্যক্তিমানুষকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে মহাশ্বেতা দেবীর আখ্যান বিশ্ব। সময়ের কাছে দায়বদ্ধ বলেই মহাশ্বেতা দেবীর লেখার সূত্রপাত ঘটেছিল। তিনি প্রথম থেকেই জনগণের ইতিহাস অনুশীলনে আগ্রহী। তাই ক্রমাগত 'প্রসেসিং' ও শিল্পীতকরণের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে তিল তিল করে বিনির্মাণ করে তুলেছেন। আর সেই সঙ্গে বিনির্মিত হয়েছে তাঁর চিন্তা-চেতনার বলয়ও, তাই তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে সময়ের গভীরতার ছাপ সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। তিনি নিজেই এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"লেখায় আমি আপাত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করায়, বিচার করায়, সময়কে দলিলীকরণে বিশ্বাস করি। কেন না, একমাত্র সেভাবেই আমার মতে, উত্তরণ সম্ভব বৃহত্তর, আরো মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ কোন আকাশে। আমি বিশ্বাস করি, গণ ও সমাজজীবন আশ্রিত ইতিহাস চর্যায়। ইতিহাসচর্যা, আমার মতে, সাহিত্য স্রষ্টার পক্ষে আবশ্যিক, মূল শিক্ষা।'' [৩]

সময়ের দলিলীকরণে বিশ্বাসী বলেই তাঁর 'আখ্যানবিশ্ব'জুড়ে রয়েছে হতদরিদ্র, লাঞ্ছিত, শোষিত, উৎপীড়িত বঞ্চিত মানুষদের বিপর্যস্ত জীবনের কথা। মহাশ্বেতাদেবী নিজেই তাঁর লেখার প্রসঙ্গে বলেছেন—

'স্বাধীনতার একত্রিশ বছরে আমি অন্ন, জল, জমি, ঋণ, বেঠবেগারী, কোনোটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্যসমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা। দক্ষিণে-বামে সকল দলই সাধারণ মানুষকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আমার জীবনকালে এ বিশ্বাস বদলাবার কারণ ঘটবে বলে আশা নেই, তাই সাধ্য মতো মানুষের কথাই লিখে গেলাম, নিজের মুখোমুখী হতে যেন লজ্জা না পাই সে জন্য। কেননা লেখক জীবনকালেই শেষ বিচারে উপনীত হন এবং উত্তর দেবার দায় থেকে যায়।''[৪]

মহাশ্বেতা দেবীর এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে, সমাজের কাছে যারা স্বাধীন নয়, শুধু উচ্চবর্গের প্রতাপের দ্বারা শোষিত, পীড়িত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত সমাজের মানুষরাই মহাশ্বেতার আখ্যান বিশ্বের কুশীলব হয়ে উঠেছে। মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর আখ্যান বিশ্বের অবয়ব গঠন করেছিলেন বলেই তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসবোধ ও সময়চেতনার প্রধান্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর এই ইতিহাস চর্যাই তাকে তাঁর লেখনীর অস্ত্র ধারণ করতে সাহায্য করেছে। আদিবাসী মানুষদের সাথে তাঁর গভীর যোগাযোগ থাকার জন্যই তাঁর উপন্যাসে ওঠে এসেছে এই সর্বহারা, সংগ্রামী, লাঞ্ছিত, শোষিত, মানুষদের কথা। তিনি নিজেই বলেছেন— *"আদিবাসী সমাজ নিয়ে যে যন্ত্রণাবোধ দীর্ঘকাল আমায় দগ্ধ করে, সে দহণ আমার সঙ্গে চিতা অবধি যাবে।''*[৫]

তাই মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে ওঠে এসেছে আদিবাসী জীবনধারা ও সংগ্রামের ইতিহাস। এই প্রসঙ্গে নির্মল ঘোষের মন্তব্য অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য *"মধ্যবিত্ত জীবনের নানা টানাপোড়েনের মধ্যে অনেক পথ হেঁটে ক্লান্ত মহাশ্বেতা এবার আদিবাসী জীবনকে খুঁজলেন ইতিহাসের পটভূমিতে। আদিবাসী জীবন তাঁর অজানা ছিল না, এবার তাকে সম্পূর্ণ করে জানা হল ইতিহাসে জীবন-অভিজ্ঞতায়।''*[৬]

অর্থাৎ মহাশ্বেতা দেবী দক্ষ ডুবুরির মত আদিবাসী সমাজ মননের গভীরে ডুব

দিয়ে তাদের জীবনের বিচিত্র জীবনধারাকে তাঁর লেখনীর স্পর্শে জীবন্ত রূপদান করেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর উপন্যাসে চিরায়ত তথা মধ্যযুগীয় উপাদান নবরূপায়ণে হাজির হয়েছে। মধ্যযুগীয় উপাদানের প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় তাঁর কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্রির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৭) উপন্যাসে। 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্রির জীবন ও মৃতু' (১৯৬৭ খ্রিঃ) উপন্যাসটি মহাশ্বেতা দেবীর একটি উৎকৃষ্ট রচনা। চুয়াড় আদিবাসীদের নিয়ে লেখা সর্বপ্রথম হল এই উপন্যাসটি। ষোড়শ শতকের রাঢ় বাংলার ইতিহাস অর্থাৎ সাংস্কৃতিক, আচার-আচরণ, জীবনব্যবস্থা ইত্যাদির দ্বারা গভীরভাবে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যদিও উপন্যাসের মধ্যে ষোড়শ শতকের মেদিনীপুরের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, তবুও চুয়াড় আদিবাসী যুবক কবি বন্দ্যঘটীর জীবনের নানা বিভঙ্গই উপন্যাসের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য এ উপন্যাস প্রসঙ্গে বলেছেন—*"ষোল শতকের বাংলায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও আদিবাসী সমাজের সমান্তরাল অস্তিত্ব, তাঁদের সংঘর্ষময় সম্পর্ক কিংবা সম্পর্কহীনতা, ইতিহাস ও পুরাকল্পের অন্যোন্যাশ্রয়িতা এবং সমাজবদ্ধ ব্যক্তির ভুল মুক্তি কামনা, সব কিছুর রসায়নে আর পুনর্নির্মাণে গড়ে উঠেছে এই বয়ান।'"*[৭]

মহাশ্বেতা দেবী আলোচ্য উপন্যাসটিকে মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন। কারণ প্রাক্ চৈতন্য যুগ থেকেই বাংলা সাহিত্য পরিপূর্ণভাবে নতুন নতুন সৃষ্টি দ্বারা বিপুল ঐশ্বর্য লাভ করেছে। ফলে চৈতন্য যুগ হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। কারণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে সমাজে উচ্চ-নীচ বর্ণ বিভাজন সব ঘুচে গেল। এই পটভূমিতেই মহাশ্বেতা দেবী লিখলেন এক অরণ্য যুবকের কবি খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত হবার কাহিনি। মহাশ্বেতা দেবী এই উপন্যাসটির প্রসঙ্গে বলেছেন—*"মধ্যযুগের রাঢ় বাংলা এক অরণ্য চুয়াড় যুবকের কবি খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রচেষ্টা ও তার পরিণতিকে কেন্দ্র করে লেখবার কথা শ্রী অসিত গুপ্ত প্রথম আমাকে বলেন। এ গ্রন্থের নামকরণও তারই।'"*[৮]

অর্থাৎ মহাশ্বেতা দেবী ষোড়শ শতকের বাতায়ণে যখন চৈতন্যদেব তাঁর

মানবপ্রেমের ধর্ম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-উচ্চ-নীচ ভেদাভেদকে অগ্রাহ্য করে এক মিলনক্ষেত্র-এ পরিণত হয়েছিল, সেই সময়টিকে আধার ও আধেয় হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর উপন্যাসের কাঠামো তৈরি করেছিলেন। মধ্যযুগের চৈতন্য প্রভাবিত সময়ে কোনো কবির কবিত্ব শক্তির উন্মেষ ঘটা ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার উপযুক্ত সময় বলে গণ্য। ষোড়শ শতকের যে সকল সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, যথা- বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত, ইত্যাদি কাব্যগুলির মধ্য দিয়ে সমাজকে জানার ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যায়। কারণ এই সময়ের ইতিহাসে লক্ষ করা যায় যে, বিভিন্ন রাজা, বাদশা, সুলতানরা যেন কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও উপাধি প্রদানে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এই রকম পরিবেশে যে কোনো মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটতে বাধ্য। তাই মহাশ্বেতা দেবী উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছেন— *"ষোড়শ শতকের রাঢ় বাংলার ইতিহাস বিভিন্ন কারণে আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। একদিকে বাংলা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রায় একই সময়ে মানবিকতাবাদী ধর্মের এক সুবিপুল নবজাগরণের পটভূমিকাটি ছিল, যা আধুনিক পৃথিবীর উদার মানবিকতাবাদী চিন্তার অন্যতম মাতৃ উৎস বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। কিন্তু এতবড় কথা বাদ দিয়েই বলি, আমার মনে হয়েছিল যে মেদিনীপুর, এতরকম বিচিত্র আদিবাসী সম্প্রদায়, লোক সংস্কৃতির জন্ম ও ধাত্রীভূমি, সেই মেদিনীপুরের অবস্থিতি কলিঙ্গ-সীমান্তে হবার দরুণ, চৈতন্য প্রভাবে সেখানকার নিম্নবর্ণের জাতির মধ্যে মানুষ হিসেবে নিজেকে জানবার ও জানাবার একটি প্রয়াস নিশ্চয় দেখা দিয়েছিল। এই চেতনার প্রমাণ কাব্য, পাঞ্চালী, গাথা, গীতি, পোটোনাচের ভেতর দিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছিয়েছে।'"*[৯]

অর্থাৎ মহাশ্বেতা দেবী মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে আকবর বাদশাহের আমল ও চৈতন্যদেবের মানবধর্মের প্রচার, এই দুই প্রকার উপাদানের মাধ্যমে এক চুয়াড় যুবকের কবিত্ব খ্যাতিতে উন্নীত হওয়ার কাহিনিকে তুলে ধরেছেন। কারণ সে সময়ে রাজসভার বিভিন্ন কবিরা রাজা বা সুলতানের নামে কাব্য রচনা করে বাঁচিয়ে রাখতেন। এই

সুবাদে ভীমাদলের রাজা গর্গ বল্লভেরও কবির প্রয়োজন হয়েছিল। কারণ তার রাজ্যে সব থাকা সত্ত্বেও কবির অভাব ছিল। কিন্তু রাজার এই অভাব দূর হল। কারণ ঈশ্বরের আশীর্বাদ স্বরূপ ভীমাদলে কবির আবির্ভাব ঘটল। তিনি নিজের নাম বলেন— কবি বন্দ্যঘটী গাঞি। তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়ে ভীমাদলে এসেছেন 'অভয়ামঙ্গল রচনার জন্য। কবি নিজেই বলেছেন— *"এ নামে আমি অভয়াবন্দনা রচব, স্বপ্নাদেশ পেয়ে আমার আগমন হে রাজন্।"*[১০] রাজা গর্গ বল্লভের কাছে গিয়ে কবি বন্দ্যঘটী দেবীর স্বপ্নাদেশের কথা জানায় এইভাবে—

"স্বপ্নে আসি কৈলা দেবী যেঞে গর্গপুরে
ছন্দপদে বন্দ মোরে গাহো তারে সুরে।।[১১]

রাজা গর্গবল্লভ কবির এই কথা শোনার পর আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন এবং কবিকে তার রাজ্যে সাদরে গ্রহণ করেন।

মহাশ্বেতা দেবী মধ্যযুগের উপাদান অর্থাৎ মধ্যযুগের বেশিরভাগ কাব্য, যথা- চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ইত্যাদি স্বপ্নাদেশের ফলেই লিখিত বলে এই ধারায় অব্যাহত রেখেছেন তাঁর উপন্যাসের মধ্যে। মধ্যযুগীয় উপাদানকে আধার ও আধেয় রূপে গ্রহণ করে এক নতুন ভঙ্গিতে তাঁর উপন্যাসে স্বপ্নাদেশের অবতারণা করেছেন। তাঁর উপন্যাসের কবি এক নতুনভাবে স্বপ্নাদেশের উল্লেখ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। অরণ্য চুয়াড় জীবন ত্যাগ করে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে, কারণ 'যোগ্যতা যার পৃথিবী তার'– এ ধারণার বশবর্তী হয়েই সে অরণ্য চুয়াড় সমাজ জীবন থেকে আলাদা হয়ে এক নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছে। উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে নিজের জন্মগত পরিচয় ত্যাগ করে অন্য এক নতুন জীবনে। এ প্রসঙ্গে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

''ভাগ্যের বিধানকে, সমাজের অনুশাসনকে, Inherited Birth-এর নিয়মকে লঙ্ঘন করে 'পিলি্থমীটো ঘুরে দেখে আসি' বলে জেদ করে যে চুয়াড়-যুবক কবি হয়ে অভয়ামঙ্গল রচে aquired Birth-এ উত্তীর্ণ হয়, এ তারই কাহিনি। অভীপ্সার

উত্তরণ বিধাতার দেওয়া জন্মকে অতিক্রম করে অন্য জন্মে উত্তরণের আশ্চর্য কাহিনি এই উপন্যাস।"[১২]

মহাশ্বেতা দেবী 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছেন যে, মধ্যযুগের বাতাবরণে একজন কবির উত্তরণ ঘটে। কিন্তু সেই সঙ্গে এও দেখিয়েছেন যে, সে নিম্নশ্রেণির মানুষ অন্ত্যজ চুয়াড় হওয়ার জন্য তার মৃত্যুদণ্ড হয়। কারণ তৎকালীন সময়ে যে বর্ণভেদ প্রথা বিরাজমান ছিল, সে জন্যই প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও তার 'মৃত্যু' অবধারিত। কারণ তৎকালীন সময়ে জাতিভেদ প্রথা যে সচল ছিল তার প্রমাণ মধ্যযুগের একাধিক কাব্যে পাওয়া যায়। মধ্যযুগের এই ধারার সময়কে নতুন করে আমাদের চিনিয়ে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী অন্ত্যজ চুয়াড় জাতির যুবকের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এই জাতিভেদের রূপটি প্রকটভাবে ধরা পড়েছে গর্গরাজের আর্তকণ্ঠে— *"যদি শূদ্র হয়ে মসীজীবী হতে ইচ্ছে হয়েছিল তবে বোষ্টম হলে না কেন, তাদের সমাজে ভেদাভেদ নাই।"*[১৩]

অর্থাৎ মহাশ্বেতা দেবী মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটকে বিনির্মাণ করে নিয়েছেন তাঁর আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে। মহাশ্বেতা দেবী কবি কঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণীত হয়ে এই উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন। তিনি নিজেই এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"মুকুন্দরামের দামিণ্যা ত্যাগের কারন তো নয়া শাসকের জুলুম জবরদস্তি। কিন্তু দেশ ছেড়ে আরড়ায় গিয়ে তিনি বাঁকুড়া রায়ের সভায় কবি খ্যাতি পান। এই কবি হয়ে ওঠার কাহিনীই আমি 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু'তে লিখেছি। আমার কবি আধুনিক কেন না সে অরণ্য জীবন ত্যাগ করেছিল। মৃত্যুর পরে নয়, জীবনকালেই তাঁর জন্মান্তর ঘটেছিল।"[১৪]

মহাশ্বেতা দেবী মধ্যযুগের পটভূমিটি ব্যবহার করে নতুন কলেবরে আলোচ্য উপন্যাসটি রচনা করেছেন। মহাশ্বেতা দেবী আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে মধ্যযুগীয় মিথের ব্যবহার নতুনরূপে তুলে ধরেছেন। আদিবাসী চুয়াড় সমাজের নানা রীতি-নীতি,

বিশ্বাস, ধর্ম-দেবোপাসনা, নানারকম জীবন ব্যবস্থার মধ্যে তিনি মিথের প্রসঙ্গকে নতুন রূপে দেখিয়েছেন। তিনি নিজেই উপন্যাসের ভূমিকা অংশে বলেছেন — *"রাঢ় বাংলার মেদিনীভূমের সাধারণ মানুষের জীবনের এই বিপুল বর্ণাঢ্যতা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। অন্যদিকে, বর্ণশাসিত সমাজের বাইরে যে অরণ্যবাসী আদিবাসী সমাজ মেদিনীপুরে অনন্তকাল ধরে বাস করছে, যারা ভারতের আদিমতম অধিবাসী তাদের সম্পূর্ণ পৃথক অস্তিত্ব, দেবোপাসনা, তাদের totem ও taboo, বিশ্বাস-প্রথা- ব্যবহার, চান্দ্রবৎসর গনণা, মাতৃকা আরাধনা, তাদের কথা আমার মনে ছিল। আমরা ও তারা একই ভূখণ্ডে বাস করি, কিন্তু তাদের ধ্যান-ধারনার জগৎ একেবারে পৃথক, আজও পৃথক, এবং এই দুই জগৎ দুই অস্তিত্বের ব্যাপারটিও আমাকে প্রলোভিত করেছিল। এদের প্রসঙ্গেই আমি আদিম এক অরণ্য হস্তিযূথের প্রতীক ব্যবহার করেছি। যে হস্তিযূথ অজিত প্রকৃতির শেষ সম্মানিত প্রতিভূ। পালকাপ্য মুনির আশ্চর্য কাহিনীটি এক পুরাকল্পের মতই মনে হয়েছে আমার আর আকৃষ্ট করেছে অভয়া-বাশুলী। বিশালাক্ষী-অরণ্যচণ্ডী-পর্ণশবরী-বিন্ধ্যবাসিনী বেদোক্ত-অরণ্যানী, নানা নামে আদিম মাতৃকা শক্তির উপাসনা, যে মাতৃকাশক্তি অষ্টম শতক থেকে শাস্ত্রীয় পূজায় আসন পায়। এই শতকে রাঢ় বাংলা, তথা গাঙ্গেয় বঙ্গের বিশদ ইতিহাস মঙ্গলকাব্য ও চৈতন্যজীবনী সমূহের মধ্যে বিধৃত।"* [১৫]

মধ্যযুগীয় সমাজ-সাহিত্য ধারায় গোষ্ঠী জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত মিথ ও বিশ্বাস। এই মধ্যযুগীয় মিথ ও বিশ্বাসকে নতুনভাবে তুলে ধরেছেন মহাশ্বেতা দেবী তাঁর আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে। উপন্যাসের মধ্যে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে নানা কিংবদন্তি। চুয়াড় সমাজের কাছে টোটেম হিসেবে স্বীকৃত হাতি ও সাপ। নিদয়া তাদের কাছে অরণ্যের প্রহরী রূপে স্বীকৃত। চুয়াড়দের পুরাকল্পের অনুসারে তাদের আদিপুরুষ হল পালকাপ্য মুনি। এক ব্রাহ্মণ ঋষির ঔরসে হস্তিনীর গর্ভজাত পুত্র। এটি একটি বহু প্রচলিত মিথ। যার উৎসরূপে স্বীকৃত হয়েছে কৌম সমাজের টোটেম। আর ট্যাবু হল এক প্রকার নিষেধাজ্ঞা। এই ট্যাবুকে নতুনরূপে চিত্রিত করেছেন

ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে, যেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে চুয়াড়দের সমাজ, রীতি-নীতি, সংস্কার ত্যাগ করার অর্থ হল হাতির পায়ে পিষে মৃত্যুদণ্ড। অর্থাৎ মহাশ্বেতা দেবী আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে মধ্যযুগীয় টোটেম ও ট্যাবুকে আধুনিক পর্যায়ে এনে নতুনরূপে প্রয়োগ করেছেন কবি বন্দ্যঘটীর জীবনের মধ্য দিয়ে। সময় ও পরিসরের ঘেরাটোপে আবদ্ধ কবি বন্দ্যঘটী শেষ সময়ে নিজের অবস্থান বুঝতে পেরেও অদৃষ্টের ওপরই নিজেকে সঁপে দিয়েছে। কারন সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল চৈতন্য প্রভাবিত সময়ে, কিন্তু জাত-পাতের বিভেদের ফলে তার জীবনে বিনা মেঘে বজ্রপাত পড়ে যায়। ফলে অরণ্য জীবন ও রাজপ্রাসাদের জীবন উভয় দিক থেকেই তার জীবন সংশয়ে পরিপূর্ণ। কারণ চুয়াড় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার শাস্তি স্বরূপ যা হয়, আর রাজার শাস্তির স্বরূপ- একই দেখানো হয়েছে উপন্যাসে। অর্থাৎ উভয় সমাজেই টোটেম হিসেবে হাতিকে গ্রহণ করা হয়েছে।

চুয়াড়দের মিথের মধ্যে হিন্দু শাস্ত্র যেমন- রামায়ণ, মহাভারত-এর নানা কিংবদন্তিকে গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে লক্ষ করা যায় যে, চুয়াড়দের আদিপুরুষ পালকাপ্য মুনিকে বন্দী করেছিলেন যে রাজা, তিনি ছিলেন দশরথের জামাতা লোমপাদ। উপন্যাসের মধ্যে মহাভারতের এক কাহিনির অনুসরণ করে নবরূপে সাজিয়েছেন উপন্যাসের চুয়াড় জাতির সংস্কারকে। কারন চুয়াড় জাতিরা নিজেদের একলব্যের বংশধর বলে পরিচয় দেয়। সেই অনুযায়ী চুয়াড় দলপতি অভিষেকের সময় একলব্যের অনুকরণে তার হাতের বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলতে হয়। মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন—

"এই চুয়াড়রা একলব্যের স্বজাতীয়, বংশ পরম্পরায় ধানুকী। ধনুক তাদের একমাত্র অস্ত্র আর এখনো এদের দলপতি হাতের বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলেন। যারা কাটে না তারাও তীর ছোঁড়াবার সময়ে ডানহাতের অন্য চার আঙ্গুল মাত্র ব্যবহার করে।" [১৬]

ঔপন্যাসিক মহাভারতের একলব্যের কাহিনির মিথকে নতুনভাবে তুলে ধরেছেন চুয়াড় সমাজের মধ্য দিয়ে। তাই চুয়াড় কবি বন্দ্যঘটীর সাথে একলব্যের সাদৃশ্য রয়েছে। মহাভারতের একলব্য জাতিতে নিম্নবর্গের মানুষ ছিলেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা হওয়া সত্ত্বেও নিষাদ জাতিতে জন্ম বলে, জাতির অপরাধে উচ্চবর্গে অধিষ্ঠিত ক্ষত্রিয় রাজগুরু দ্রোণাচার্য একলব্যকে ধনুর্ধর হতে দেন নি। তেমনভাবে আমরা আলোচ্য উপন্যাসে দেখি যে, জাতিতে অরণ্য চুয়াড় হওয়ার জন্য অসাধারণ প্রতিভাশালী হয়েও উচ্চবর্গের সমাজে বন্দ্যঘটীর কোনো মূল্যই রইল না। বরং তাকে এই প্রতিভার জন্য চরম মূল্য দিতে হল। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী সময় ও পরিসরের সুনিপুণ প্রয়োগে মধ্যযুগীয় উপাদানের যথাযোগ্য প্রয়োগ নবরূপে করেছেন বন্দ্যঘটীর জীবনের মধ্য দিয়ে। সময়ের সাথে সাথে অরণ্য চুয়াড় যুবক বন্দ্যঘটীর নবজীবন ঘটাতে পারতেন। কিন্তু মধ্যযুগীয় বাতাবরণের ফলে অসাধারণ প্রতিভা একজন নিম্নজাতির মধ্যে থাকলেও সমাজ তাকে যে মেনে নেয় না, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আলোচ্য উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। তাই অরণ্য চুয়াড় যুবকের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়।

"মহাশ্বেতা দেবী মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে ইতিহাস ও পুরাণকে আশ্রয় করেছিলেন। মধ্যযুগের চুয়াড় সন্তান myth শাসিত সমাজকে ভাঙতে পারে নি। সে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে— তার চুয়াড় সংস্কার তাকে সেই পৌরাণিক পরিবেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।'"[১৭]

আলোচ্য উপন্যাসে লক্ষ করা যায় যে, বন্দ্যঘটীর জন্ম প্রান্তিকায়িত পরিসরে হলেও সে পাঁকে পড়ে থাকতে চায়নি। সে নিজের বুদ্ধি বলে অন্য জগৎ খুঁজতে বেড়িয়ে পড়েছিল। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল যে, 'যোগ্যতা যার পৃথিবী তার' অর্থাৎ 'Career open to Talent' তাই ভীমাদলে গর্গরাজের রাজ সভায় তাঁর কবি রূপে প্রবেশ। কিন্তু কবির ধারণার ভুলের জন্য কড়ায়-গণ্ডায় তাকে এর জন্য মাশুল গুণতে হয়েছিল। কারণ কবি অন্ত্যজ চুয়াড় হয়ে উচ্চবর্গে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন

দেখেছিল। সেই স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্খা তার জীবনের কাল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ চৈতন্য প্রভাবিত সময়ে সমাজের মধ্যে যে ভক্তি ধর্মের বন্যা বয়েছিল, সেই ভক্তির বন্যায় নিম্নবর্গের মধ্যে থেকে অনেক গায়ক, কবির জন্ম হয়েছিল। কিন্তু তখন উচ্চবর্গে অধিষ্ঠিত সমাজ তাদেরকে সুনজরে দেখত না। কারন তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেই তারা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করত। কিন্তু চুয়াড় যুবক যে নিম্নবর্গের মানুষ হয়েও অসাধারণ প্রতিভার বলে নিজের জায়গা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে উচ্চবর্গের দাপটে নিজের প্রতিভা ও স্বীকৃতি পেল না। এর কারণ প্রসঙ্গে এক সমালোচক লিখেছেন—

"তাছাড়া কবির উপর শাসক বর্গের প্রচণ্ড ক্রোধের একমাত্র কারণ, পরিচয় গোপন করা নয়। তাদের সবচেয়ে বড় ভয় ছিল অন্ত্যজ জাতির মধ্যে এমন এক প্রতিভাবান মানুষের আবির্ভাব নিম্ন শ্রেণী ও বর্ণদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগাবে। তারা আর নিজেদের শাস্ত্রের বিধান অনুসারে নিজেদের কীটানুকীট মনে করবে না। উচ্চবর্ণের পায়ের তলায় থাকতে রাজি হবে না। এই যদি কবিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আসল কারণ হয়, তাহলে বৈষ্ণব হলে বা নিদয়া অরণ্যে বসে চুয়াড় মঙ্গলকাব্য লিখেও তিনি নিষ্কৃতি পেতেন না। যদি না তার খ্যাতি স্বজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।"[১৮]

সমালোচকের এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে, নিম্ন জাতির প্রতিভা থাকলেও উচ্চবর্গের দাপটে সে প্রতিভাও নষ্ট হয়ে যায়। কারণ উচ্চবর্গে অধিষ্ঠিত মানুষরা চিরকাল নিম্নবর্গের মানুষদের যে শোষণ করে চলে তারই একটি রূপ দেখানো হয়েছে উপন্যাসে জাতি-ভেদের মধ্য দিয়ে। মধ্যযুগের একাধিক কাব্যের মধ্যে যে বর্ণ-বিভেদের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই পরিসরকেই আধেয় হিসেবে গ্রহণ করে মহাভারতের একলব্যের জাতি পরিচয়কে কেন্দ্র করে নিম্নশ্রেণির অন্তর্গত সমাজ ব্যবস্থার রূপটিকে নতুন করে তুলে ধরেছেন আলোচ্য উপন্যাসে—

"জাতকর্মের বাইরে অন্যকাজ করতে চুয়াড় দল বড় ভয় পায়। তাদের এক স্বজাতি একলব্য জাতধর্মের বাইরে কাজ করতে গিয়ে হাতের আঙ্গুল বিসর্জন

দিয়েছিল।"[১৯] অর্থাৎ ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী এখানে দেখাতে চেয়েছেন যে, চুয়াড় জাতি নিম্নশ্রেণিভুক্ত, তারা তাদের পরিসরেই সীমাবদ্ধ থাকতে অভ্যস্ত। তারা তাদের সীমা লঙ্ঘন করতে চায় না। তারা মনে করে যে, যার যেখানে অবস্থান সেখানেই থাকাকেই তারা শ্রেয় বলে মনে করে। অর্থাৎ তারাও পরোক্ষভাবে বর্ণাশ্রম প্রথার সমর্থক। কারণ চুয়াড় দলপতির কথার মধ্যদিয়ে সেদিকটিই ইঙ্গিত দেয়—

"হা দেখ, তু' চুয়াড় হঞে জন্মেছিস, চুয়াড় হঞে জন্ম কাটাবি, ই কথাটি তুর কপালে লিখা আছে। ... চুয়াড়ের পোঞার অত লড়তে চড়তে লাই, জানলি? [২০]

কিন্তু কবি বন্দ্যঘটী সে ভাবে চিন্তা করে নি, তাই তার জীবনের এত দুর্বিষহ অবস্থা ঘনিয়ে এসেছে। কারন এক নিম্ন জাতির মানুষ হয়ে 'অভয়াপাঞ্চালী' লেখার জন্য বন্দ্যঘটীর নাম কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের সঙ্গে তুলনীয়। ফলে অন্ত্যজ শ্রেণির একজন মানুষের অসামান্য প্রতিভার জন্য যদি উচ্চবর্গে অধিষ্ঠিত সমাজ যাতে বিপদে না পড়ে তার জন্যই বন্দ্যঘটী রচিত সকল পুঁথি পোড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন রাজা। আর বন্দ্যঘটীর নাম মুছে দিতে চেয়েছে *"... কবিকে এমন শাস্তি দিতে হবে, যা দেখে অধম মানুষের মনে 'ভোবনে লিজের ঠাঁই খুঁজতে যাই' এ ইচ্ছেটি চিরতরে ঘুচে যায়।"* [২১]

এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে, তৎকালীন সময়ে নিম্নশ্রেণির মানুষের মধ্যে এক নতুন ধরনের চেতনার বিকাশ ঘটছে। কিন্তু রাজা ভয় পেলেন যে, অন্ত্যজ শ্রেণির এই চেতনার বিকাশ তাদের শাসন ব্যবস্থাকেও ধুমড়ে মুচড়ে ফেলতে পারে। তাই কবির মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার মধ্য দিয়ে অন্ত্যজ জাতির বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে দিতে চেয়েছেন। কারণ, - *"ইতর জেতে মাথায় চঢ়বে, অধমজাত বোলবে আমাদের সমাজের মানুষ যদি পুঁথি পাঞ্চালী লিখে তাহলে আমাদের চেয়ে তোমরা বড় কিসে? ... প্রজা ত্যাখন রাজা হতে চাইবে। তিওর কেওট বেবসা করতে যাবে, হাড়ীমুচি পাঞ্চালী লিখতে যাবে, সমাজের যে মহা সর্বনাশ হবে হে!"* [২২]

তাই রাজা নিজের প্রতিপত্তি, নাম, যশ বজায় রাখার জন্য কবিকে শাস্তি

দিয়েছেন। কারন চুয়াড় জাতির মানুষের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি ঘটে না। তাই কবি বন্দ্যঘটী উচ্চবর্গের মানুষদের কাছে প্রশ্ন করেন, *"পৈতে পরলে তোমার পৌত্রের দ্বিতীয় জন্ম হয়, সে দ্বিজ হয়। দ্বিজ সে-ই যার দু'বার জন্ম হয়। পাখ্-পক্ষীকে নাগ-নাগিনীকে ত' তোমরা প্রথমে ডিম হয়ে জন্মায় বোলে দূষ না? মুক্তাকে শুধাও না, আগে কেন ঝিনুক হয়ে জন্মালি? আমি চুয়াড় নই, আমি কবি বন্দ্যঘটী গাঞি, অভয়াসেবক, এ পরিচয়ে আমার দ্বিতীয় জন্ম, সেটি কি তোমরা কেড়ে নিতে পার?"*[২৩]

বন্দ্যঘটী চুয়াড় জীবন ত্যাগ করে এক নতুন জন্ম নিয়েছিলেন। এক নতুন জগৎ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, জাত-পাতের সীমায় আবদ্ধ না থেকে এক নতুন স্বপ্ন নিয়ে এক আলাদা জগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। সেখানে তিনি নিজের অস্তিত্ব, অনুভূতির জগৎ প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। কবিকে সে জগৎ সৃষ্টি করতে দেয়নি উচ্চবর্গের অধিষ্ঠিত শাসন কাঠামো। কবি শুধু বলেছিলেন— *"ধনজন মাঙ্গি নাই হে! অন্য জন্মে যাব, অন্যরকম হব, সেই আকাঙ্খায় আমি ভীমাদলে আসি।"*[২৪]

কিন্তু কবির মৃত্যু অবধারিত। সমাজও তাকে ত্যাগ করেছে। তার প্রেমিকা ফুল্লরাও তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সবশেষে কবি আশ্রয় নিয়েছেন তার আদিম অরণ্য মাতৃকার অরণ্যে। কিন্তু কবি ব্যর্থ হলেন কারন, কবির মনে হয়েছে যে অরণ্যও তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। নগরেও তাঁর ক্ষমা হয়নি। তাই কবি ভেবেছিলেন অরণ্যই তার একমাত্র আশ্রয়স্থল। কারন অরণ্যে ঢুকতে না পারলে তাঁর জীবন সংশয়ে পরিণত হবে। তাই কবি 'লতাজাল' ছিড়ে ছিড়ে বনের মধ্যে পথ খুঁজতে লাগলেন। কারন কবি মাতৃ জঠরে ঢুকে যেতে পেরে নিশ্চিত হবেন, *"মায়ের লাড়ীর মধ্যে যাব, তাঁতের লাড়ীর মধ্যে যাব, পোঞা যেমন থাকে তেমুনি থাকব।"*[২৫]

কিন্তু কবি শেষ পর্যন্ত মাতৃজঠরে পৌঁছাতে পারেন না। তার আগেই তিনি রাজসৈন্যের কাছে ধরা পড়ে যান। তার স্বপ্ন এভাবেই ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। তাঁর নবজন্ম আর ঘটে নি। মহাশ্বেতা দেবী এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের ভূমিকা অংশে লিখেছেন—

"হয়তো আমি এমন এক যুবকের কথা লিখতে চেয়েছি যে তার জন্ম ও জীবনকে

অতিক্রম করে নিজের জন্য একটি দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, যে জগৎ তার নিজের সৃষ্টি। চেয়েছিল নতুন জন্ম নিতে এবং সমসাময়িক সমাজ তার প্রত্যেকটি চেষ্টাকেই পরাভূত করেছিল, আমি হয়তো তার গল্পই লিখতে চেয়েছি।"[২৬]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবির মৃত্যু তাকেই জয়ী করে তুলেছে। কারন তার মৃত্যুর জন্য যারা তাকে মরণের দিকে ঠেলে দিয়েছিল, তাদের জীবনেও একরকম বিপর্যয় ঘটেছিল। গর্গরাজা, হরিশ রায়ার মত নির্মম ব্যক্তি অনেকে কবির প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধার বাঁধনে ধরা পড়েছিলেন। কবির জন্য তাদের মমতাও জেগেছিল। কিন্তু সমাজের নিয়মানুসারে কবিকে শাস্তি দিতে হয়েছিল। এভাবেই মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞ্রির জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাসটিতে চিরায়ত তথা মধ্যযুগীয় উপাদানের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর ইতিহাস চর্যাই তাকে লেখনীর অস্ত্র ধারণ করতে সাহায্য করেছে, তাই তাঁর প্রতিটি লেখার মধ্যেই ইতিহাসের গভীরতার দিকটি উঠে এসেছে। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'বিবেক বিদায় পালা' (১৯৮৩) উপন্যাসে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক সময়ের পটভূমিতে মধ্যযুগীয় বঙ্গদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বরূপটি তুলে ধরেছেন। আলোচ্য উপন্যাসে প্রধানত পঞ্চদশ শতকের রাঢ় বাংলার হুসেন শাহের রাজত্বকালের সামাজিক সমস্যার স্বরূপটি ফুটে ওঠে ঔপন্যাসিকের বয়ানে। চৈতন্যের সমসময় ও বাংলার সমাজ এই উপন্যাসের মূল পটভুমি। আলোচ্য উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র চৈতন্যদেব নন, ব্রাহ্মণ বটু হল উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। একই তিথি ও লগ্নে এই দুইজনের জন্ম হয়েছে সমাজের একই ভূমিতে। একজন সমাজে অবতার রূপে পরিচিত লাভ করেন, আর অন্যজন সমাজে বাঁচার জন্য ন্যূনতম অধিকারও পায়নি। বটুর শারীরিক বিকৃতিই তাকে সমাজে বাঁচতে দেয়নি মাথা উঁচু করে। অর্থাৎ মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে মহাশ্বেতা দেবী এই উপন্যাসের বিভিন্ন ঘটনাকে ব্যক্ত করেছেন, যার মধ্য দিয়ে তাঁর মধ্যযুগীয় ইতিহাস চর্যারই পরিচয় পাওয়া যায়।

আলোচ্য উপন্যাসের প্রস্তাবনায় মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন—

"যেহদিনে জন্মেন চৈতন্য অবতার
সেহদিনে জন্মে এক ব্রাহ্মণকুমার।।
খর্বতনু বক্রকায় ভীষণ দর্শন
যেহো দেখে সেহো ভরে চিন্ত্যে কিছুক্ষণ।।
মাতা কান্দ্যে, আয়ী কান্দ্যে, কান্দেন পড়োশী
পিতা কোলে মুঞি জাঞে খড়ি পেতে বসি।।
খড়ি পেতে গোণে পিতা জয়ধ্বনি দেয়
বোলে এ দৈবের ইচ্ছা জানিলুঁ নিশ্চয়।।
দৈবযোগে জন্মে নিমাই দেবতা সে হবে
মোর পুত্র নরাকারে কীর্তি রেখে যাবে।।

ই বাম্ভোনের ঘরে বিধি বামন সির্জায়। ই ছেলা বামন, গেঁড়া, মুণ্ড বড়, দেহ টলমল করে। ছেলা দেখে ডর খায়ে মা, দুধ দিতে ডরায় কিন্তু ছেলার চক্ষু যেমন লবণসাগর। এক লগ্নে কত ছেলা জন্মে মা, কুন্‌টি হাসিতে আইল, কুন্‌টি কান্দিতে, বিধাতা ছাড়া কে জানে গো? রক্তের ডেলার চক্ষুতে এত কান্না দিয়া কে পাঠাইলে গো? চক্ষে পানি বর্ষে না তবু যেমন কান্না হা হা করে।" [২৭]

অর্থাৎ মহাশ্বেতা দেবী চৈতন্যদেব ও বটুর একই তিথি ও লগ্নে জন্ম হলেও বটুর মধ্য দিয়ে পঞ্চদশ শতকের রাঢ় বাংলার ইতিহাস, অর্থাৎ মধ্যযুগের বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পণপ্রথা, সতীদাহ প্রথা যে স্বাভাবিক নিয়মে চলত তার বয়ানও আধুনিক ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। এছাড়াও সে সময়ে পুরুষরা যে একাধিক উপপত্নী রাখতেন, বৃদ্ধ পাত্রের সঙ্গে অনেক বালিকা মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত, তাছাড়া ছেলে-মেয়েকে বিক্রি করে দেওয়া হত, তারও পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসটির মধ্যে। সতীন সমস্যা একটি বড় সমস্যা সেই সমস্যার চিত্রও আলোচ্য উপন্যাসে পাওয়া যায়।

মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার সবথেকে নিষ্ঠুর রীতি হল বাল্যবিবাহ প্রথা। উপন্যাসে লক্ষ করা যায় যে, বটুর বাবা কৌলীন্য প্রথা রক্ষার্থেও তার তিন মেয়ের 'আবুইঢ়া' নাম খণ্ডন করতে তারই এক সমবয়সী পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। উপন্যাসের মধ্যে ঔপন্যাসিক বাচনে এই দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

"রাঙির বয়েস বারো, বেঙির নয়, চেঙির বুঝি তিন। তা, তিন বোনকে রাঙির বাপ একই বরে বিয়ে দিয়ে আইবড় নাম খণ্ডে রেখেছে।"[২৮] অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে কুলীন পিতারা যে সমাজের ভয়ে মেয়েদের অল্প বয়েসে বিয়ে দিয়ে দিতেন তার পরিচয় আলোচ্য উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। এছাড়া বুড়ো পাত্রের সাথে যে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত, এবং স্বামী মারা গেলে যে বৃদ্ধ স্বামীর সাথে স্ত্রীকেও জীবন্ত সতী করা হত তারও পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসে— *"কচি মেয়েকে বুড়ো বরের মড়ার সহিত যুগিরা জীয়ন্তে মাটির নীচে সতী-গাড়া করলে সে যখন কান্দে, মানুষ জয়-জয় জোকার দিয়া উল্লাসে নাচে।"*[২৯]

তৎকালীন সময়ে কুলীন সমাজের সংস্কারই সমাজের বিধান ছিল। সমাজের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে কুলীনরাই ছিলেন। তাদের প্রতাপ সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বলেছেন— ''এ গ্রামে কুলীন সমাজের দাপটে বনের বাঘিনি গোরুর গোহালে এসে শাবক বিয়ায়। আকাশের জল রোদ চাঁদ-সূর্য নদীর স্রোত আর মানুষের জন্ম-মৃত্যু ছাড়া আর যা কিছু আছে মানব সংসারে সবই কুলীন কুলপতিদের শাসনে চলে।"[৩০]

এই কুলীন সমাজের একজন হলেন বটুর পিতা। সে বটুর জন্ম তিথি, লগ্নকে হাতিয়ার করে নিজের সন্তানকে 'দৈব' ছেলে বলে পরিচয় দেন এবং বলেন— *"মোর পুত্র নরাকারে কীর্তি রেখে যাবে নিশ্চয় জানলাঙ। দেখ। ই ছেলার রাশনাম বিবেক আর ই বামন গেঁড়া আকার ধর‍্যেছে ই এক দৈব ছলা। ই পুত্তরে সভে বটু বল্যে ডেক্য। আর নামে সম্ভাষিয়্যে না।''*[৩১]

অর্থাৎ মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় বটু বামন গেঁড়ার জন্য যে তার বোনেদের স্বামী নিবে না, 'অব্যিয়তির'[৩২] বিয়ে হবে না, মানুষ নিন্দা করবে, সমাজের সকল

ভয়ের জন্যই বটুর পিতা বটুকে দেবাংশী ছেলে বলে প্রচার করেছিলেন। মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় এই ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষ যে বাঁচতে চায়, তারই পরিচয় উপন্যাসে উঠে এসেছে।

আলোচ্য উপন্যাসে যে ডিহিদার, পোতদার, প্রমুখের উল্লেখ পাওয়া যায়, খাজনা আদায়ের জন্য, তাদের অত্যাচারে সমাজের মানুষরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, এবং অনেকে দেশান্তরীও হন। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক লিখেছেন— *"চাষি ডিহিদারের আরিন্দা দেখলেও ভয়ে কাঁপে, গ্রামস্বামীর লেঠেল দেখলেও তার প্রাণ উড়ে যায়। ফলে এই সালিয়ানা জোগাতে না পেরে বছর-বছর কিছু গৃহস্থ, কিছু চাষি ঘর ছেড়ে দেশান্তরী হয়। তাদের ভিটা কখনো অন্য প্রতিবেশী বা ভূ-স্বামী দখল করে, কখনো সে ভিটায় দিনমানে শিয়াল খেলে বেড়ায়।'* [৩৩]

মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় এ ছিল এক মর্মান্তিক ঘটনা। কারণ মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে একই পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কবি মুকুন্দরামকেও ডিহিদারের অত্যাচারে তাঁর পৈতৃক নিবাস দামিন্যা ত্যাগ করতে হয়েছিল। মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় এ এক মর্মান্তিক পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতির নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক।

লক্ষনীয় যে, নিমাই ও বটুর একই সময়ে জন্ম হলেও নিমাই অবতার রূপে সমাজে পরিচিত লাভ করে, কিন্তু বটু তাঁর বাঁচার তাগিদে নিজের পরিচয়কে পিছনে ফেলে দিয়ে নতুন রূপে আবির্ভূত হল সময়েরই আবর্তনে। কারন সময় যত এগিয়ে যেতে লাগল বটুও সময়ের সাথে সাথে নিজেকে চিনতে শিখল, জানতে শিখল যে, এ সমাজ তাঁর জন্য নয়। সমাজের নানা সংস্কার, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি বটুকে আর ধরে রাখতে পারল না। যে পিতা নিজের মেয়েকে সামান্য কিছু টাকার লোভে বিক্রি করে দেয়, তার মত ঘৃন্য কাজ আর মনে হয় সমাজে নেই। তাই সে বলে— "পাপ করতে! ভাল হব কেনী? সকল তো পচে গিছে রে, সকলি শ্মশান হয়ে গিছে! হেথা রব না আর।" [৩৪]

মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার এই নিষ্ঠুর সামাজিক রীতি-নীতি, নানা সংস্কার সম্পর্কে বটু অবহিত হয়েছিল, বলেই সে তার সমাজকে ছেড়ে দিয়ে অন্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, সমাজে এর স্থান কোথায়, তা দেখার জন্যই। এখানে বটুর চরিত্র নতুনরূপে ধরা পড়ে আলোচ্য উপন্যাসে। ফলে বটু সাধারণ মানুষ হয়েও দেবতা হয়ে ওঠে —

"মনিষ্যের পেটে জন্ম, মনিষ্যের ঘরে লালন কিন্তুক আজ ক'সন হয় বাবার পরে বামনবতার ভর হয়।"[৩৫] বটু সমাজের পাপের ভয়েই যে ঘর ছেড়েছিল এবং সময়ই যে তাকে দেবতা করে তুলেছে, সে প্রসঙ্গে দুখেকে বটু নিজেই বলেছে—

"আমি কে রে দুখে? পোকের পোক, পতঙের পতঙ! নিশির পূজা খাই, গদন মোর নামে ঢোল দেয়। মোর মাঝে ভাল লাই কিছু, তাই আমি দেবতা হঞাছি। বড় পাপে ভর্যে ঘেঞেছে সভ, ই শুনে শুনে কানে পোক পড়্যে, তাই দেখতে বেড়িয়্যে আলাঙ। ... ভাল হলে মানুষ মরে তাই আমি মন্দ হয়্যেছি।"[৩৬]

সামাজিক অবস্থা ও পারিবারিক অবস্থার কারনে বটু ঘর ছেড়েছিল। বটু এখন স্বপ্নে দেখে যে, তাঁর অন্তর থেকে উঠে এসে তাকে নিমাই ও তার মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে দিচ্ছে। কারণ একই সময়ে জন্ম হলেও নিমাই আজ দেবতা রূপে পূজিত আর সে কেন এরকম অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, সে সম্পর্কে সে নিজেই স্বপ্নে বলেছে— *"সেজনা দেবতা হতে পার্যে গো মা! আমি বামনগেঁড়া, আমার চক্ষুতে শুধুপাপ আর পাপ দেখি। তাতে আমি পাগলক্ষেপা দেশে দেশে ঘুরি। আমারে ঘরে রইতে দিল্য নাই কেউ! পাপে পাপে সাপের বাসা-আমারে ঠেল্যে বার করল। তা তো তুমি দেখ না।"*[৩৭]

দেশকে, সমাজকে, সামাজিক অবস্থানকে চিনে নেবার অঙ্গীকার, আপন সৃষ্টির অহংকারে বটু আত্মমগ্ন। অর্থাৎ মহাশ্বেতা দেবী বটুর মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে সময়ের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের চিত্রকে তুলে ধরেছেন আলোচ্য উপন্যাসে।

মহাশ্বেতা দেবী আলোচ্য উপন্যাসে নারীর অবস্থান চিত্রণে মধ্যযুগীয় উপাদানের ব্যবহার করেছেন। ঔপন্যাসিক আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়েও মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে নারীর সামাজিক অবস্থানের স্বরূপটি আলোচ্য উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে নারীর জীবন ও জগতের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে নারীর জীবন বিপন্নতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। আলোচ্য উপন্যাসে মেয়েদের অবস্থান পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যে কেন্দ্রীভূত। বামন যখন তাঁর ছেলেকে নারীর অবস্থানের কথা বলছে, তখন তা মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থারই পরিচয়বাহী— *"... য্যাতকাল পারবে পায়ের নীচে রাখবে, জানুঁ বাপ। তা বাদে হেঁসেলে ঢেঁকশেলে মেয়েছেলার ঠাঁই! আমার দেহ গত হলে বেঁধেছেঁদে মাগিকে সঙ্গে দেবে, জাঁনু? ই কাজটি তুমার।''* [৩৮] অর্থাৎ মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান যে সংকুচিত সে দিকটিই আলোচ্য উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। সুলতান হুসেন শাহের আমলে নারীর সামাজিক অবস্থা যে বিপন্ন ছিল তারই পরিচয় ঔপন্যাসিক বাচনে উঠে এসেছে *"সুলতানের নখের নখ, দাসের দাস সব রাজপুরুষদের দাপটে-নবদ্বীপ মণ্ডলীর মানুষ জন অস্থির। সবচেয়ে বিপন্ন বোধ হয় মেয়েরা। তারা রামের হাতে ও মরে, রাবণের হাতেও।''*[৩৯]

ঔপন্যাসিক বোঝাতে চেয়েছেন যে, সমাজে নারীরা সবক্ষেত্রেই লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও শোষিত। মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় যে দাসদাসী কেনা-বেচার রীতি ছিল, সেই রীতিরই পরিচয় পাওয়া যায় আলোচ্য উপন্যাসে, এবং তান্ত্রিক অভিচারের উদ্দেশ্যে যে নারীদেরই শিকার হতে হত, তারও পরিচয় ঔপন্যাসিক বাচনে স্পষ্ট— *"গভীর রাতে দূরের পল্লি থেকে মেয়েদের অস্ফুট কান্না শুনে বোঝা যায় তান্ত্রিক অবিচারের উদ্দেশে কে কার মেয়েকে ধরে নিয়ে গেল।''*[৪০]

তাছাড়া, সুলতানি আমলে রাজপুরুষদের ব্যবহার ছিল মেয়েদের প্রতি অপ্রীতিকর। ঔপন্যাসিক তাদের ব্যবহারকে 'ছাগলা ব্যবহার' বলে উল্লেখ করেছেন। এই রাজপুরুষদের প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন— *"তারা মেয়েছেলে দেখলে সত্বর পাছু ধায় ও 'তুম্ভি মোর বাপ' বললেও রেয়াত করে না।''*[৪১] আবার এই সময়ের

স্ত্রীরা যদি সন্তানের জননী না হতে পারে, তাহলে সমাজে তাকে 'অলক্ষী' বলে অভিহিত করা হয়— *"বাঁজা মেঞা সোম্‌সারে অলক্ষী ডাক্যে গো।"*[৪২] পারিবারিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্থান ছিল নিম্ন পর্যায়ে। আলোচ্য উপন্যাসে এই দিকটিই ঔপন্যাসিক নতুন রূপে তুলে ধরেছেন।

মধ্যযুগীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যে, পণপ্রথা, বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, তন্ত্রসাধনা, উপপত্নী রাখা ইত্যাদি মহাশ্বেতা দেবীর হাতে নবরূপায়ণে আলোচ্য উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছ। পণপ্রথার দিকটিই উঠে এসেছে প্রহ্লাদ ও অতসীর বিয়ের প্রসঙ্গে। কারণ অতসীর সাথে প্রহ্লাদের বিয়ে ঠিক হয়েছে পণকে কেন্দ্র করে। অতসীর বাবার কাছ থেকে প্রহ্লাদরা যে পণ পাবে, তাতেই তাদের পারিবারিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। তাই প্রহ্লাদ তার মাকে বলে— *"সব মেঙ্গে লিও। যাতে তোমার দুঃখ ঘুচে সব লিও।"*[৪৩] *আর প্রহ্লাদের মা বামনিও বলে "সব চেয্যে লিব বিশু!"*[৪৪] এ থেকে মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার পণপ্রথা নামক সামাজিক দিকটিই আলোচ্য উপন্যাসে নবরূপে তুলে ধরা হয়েছে। আর বাল্যবিবাহ, এমনকি বৃদ্ধ পাত্রের সঙ্গে কমবয়সি মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত তারও পরিচয় পাওয়া যায়, আলোচ্য উপন্যাসের প্রহ্লাদের তিন বোন-রাঙি, বেঙি ও চেঙ্গির বিয়ে হয়েছিল প্রহ্লাদের বাবার প্রায় সমবয়সি এক পাত্রের সঙ্গে। রাঙি, বেঙিকে শ্বশুর বাড়ি পাঠানো হলেও সেখানে উপপত্নীর দ্বারা রাঙি ও বেঙির উপর নেমে আসে অকথ্য অত্যাচার-উৎপীড়িত ও লাঞ্ছনা। ফলে রাঙিকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলল বরের উপপত্নী। কিন্তু বেঙি কোনো ভাবে বেঁচে যায় জলপাত্রটির হাত থেকে। ঔপন্যাসিক এই সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় সময়ে নারীর অস্তিত্বের বিপন্নতার দিকটি নবরূপায়ণে আলোচ্য উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় জাত-পাত, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ যে প্রবল ছিল, তার স্বরূপ হিসেবেই আলোচ্য উপন্যাসে নারী-পুরুষের সনাতন প্রেমের স্বপ্ন কে কখনো সার্থকতায় পৌঁছাতে পারে না- নিম্নবর্গের অন্তর্গত বাতাসিও উচ্চবর্গের

অন্তর্গত প্রহ্লাদের মধ্য দিয়ে যেন সে কথাই দ্যোতিত হয়। বাতাসি প্রহ্লাদের ভালোবাসা পেতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ আর কায়স্থের যে জাতিগত সামাজিক সমস্যা ছিল, তার জন্যই বাতাসির মুখে উচ্চারিত হয়েছে— *"বোলি ঠাকুর! তোমার দয়াতে কীটপতঙ বাঁচে, নদী উল্টামুখে ধায়। তুমি মোকে আর জন্মে বামুনের ঘরে জন্ম দিও।"*[৪৫]

এই জাতপাতের বিভেদের জন্যই বাতাসি আর প্রহ্লাদের মিলন সম্ভব ছিল না। ফলে বাতাসির অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হলেও সে বিয়ের আগে আত্মহত্যা করেছিল। বাতাসির এইভাবে মৃত্যু কী সমাজের কতৃত্বধারী ব্যক্তিদের কিছু বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিল? কিন্তু বাতাসির এইভাবে মৃত্যুবরণ করা নারীর বিপন্নতার দিকটিকেই তুলে ধরা হয়েছে। বাতাসির মৃত্যু প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন— *"বাতাসি ডুব দিল। জলের নীচে কত শান্তি কোনো গোলমাল নেই। বাতাসির সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল। জলের নীচে এত শান্তি আছে বাতাসি তা জানত না কেন?"*[৪৬]

সমাজের কঠোর নিয়মের কাছে পরাস্ত হয়ে বাতাসি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। মধ্যযুগীয় সামাজিক পরিমণ্ডলে চিত্রিত বাতাসির চরিত্রটি অন্ধ সংস্কার বা প্রথায় আবদ্ধ সমাজে একটি নারীর বিপন্নতার কথাই ব্যক্ত করে।

আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে মধ্যযুগীয় সংস্কার অর্থাৎ তুক্‌তাক্, তন্ত্রমন্ত্র বাণ মারা ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। তন্ত্রের বিভিন্ন আচার পালনে কুমারী মেয়ের প্রয়োজন হয় তারও পরিচয় পাওয়া যায় আলোচ্য উপন্যাসে। কুমারী মেয়েদেরকে কাপালিক তার তন্ত্রমন্ত্রের অভিচার করে, তার পরিচয় পাওয়া যায় আলোচ্য উপন্যাসে। *"তন্ত্রের অনেক আচার নিয়মে কুমারী মেয়ের দরকার। মায়াপুরের মানুষ সন্দেহ করে নিশি হাড়িনী কাপালিককে মেয়ে এনে দেয়।"*[৪৭]

অর্থাৎ এই নিম্নশ্রেণির অন্তর্গত নিশি হাড়িনীই যে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মেয়ের খোঁজ রেখে সপ্তগ্রামের দাস ব্যবসায়ীদের কাছে বেঁচে দেয়। এই কাজে মেয়ের বাবাকে দু'চার কাহন কড়ি, রূপোর ঢেবা বা সুলতানি টাকা দিয়ে মেয়েকে তাঁর বাবার কাছ

থেকে কিনে নেওয়ার প্রসঙ্গটি আলোচ্য উপন্যাসে মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটটিকেই নতুন করে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসে লক্ষণীয় যে, উচ্চবর্গের অন্তর্গত বামন সামান্য কিছু টাকার লোভে নিজের মেয়ে বেঙিকে পর্যন্ত বিক্রি করে দেয় দাঁত ভাঙ্গা সাধুর কাছে। এই মেয়েরা পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যে নিজেদের অসহায়, বিপন্ন মনে করে। এইভাবেই মেয়েরা তান্ত্রিক অভিচারের শিকার হয়ে যায়। সাধুরা যে মেয়েদের নিয়ে তান্ত্রিক অনাচারে লিপ্ত করায়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিশি হাড়িনীর কথার মধ্য দিয়ে— *"কারে বাণ মারবে, কারে সর্বনাশ করবে, কারে প্রাণে মারবে, সি কারণে। তারা বিনা যোবতী মেঞা কেও খুঁজে না।"*[৪৮]

মহাশ্বেতী দেবী আধুনিক চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় সমাজ বাস্তবতার এক জীবন্ত সমস্যাকে নবরূপে তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। সেই সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে সতীদাহের প্রসঙ্গটিও। মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হলে জীবিত স্ত্রীকেও মৃত স্বামীর সাথে দাহ করা হত, সেই প্রসঙ্গটি উঠে এসেছে ঔপন্যাসিকের বাচনে— *"অনেক দূর থেকে ঢাকের শব্দ আসছে। এসময়ে ঢাক বাজায় কে? কোনো ঢোল-শোহর ও পড়ে কি? না কেউ সতী হয়?"*[৪৯]

মধ্যযুগীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক জগতে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যে নারীর স্থান সংকুচিত। সেদিকটিই আলোচ্য উপন্যাসে মধ্যযুগীয় উপাদানের নিরিখে নবরূপায়ণে ওঠে এসেছে ঔপন্যাসিকের বয়ানে।

মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল জাত-পাতের দ্বন্দ্ব। সেই জাত পাতের সমস্যাকে নবরূপে আধুনিক ভঙ্গিতে আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। নিম্নশ্রেণির অন্তর্গত 'নিশি' চরিত্রটির মধ্য দিয়ে।

"ব্রাহ্মণরা ওদের মানুষ বলে গণ্য করে না। মন্দিরে ওরা ঢুকতে পায় না। তাই ওরা মনসা, বাশুলী পুজো করে, নিজেদের দেবদেবী নিয়ে থাকতে চায়। কেউ কেউ *গিয়ে কলমা পড়ে মুসলমানও হয়। বলে 'সেথা অত লাথি নাই হে! এর ছেঞা লাগলে উ খড়ম তুলে না।'"*[৫০]

উচ্চবর্গের দাপটে সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষরা উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত। উচ্চবর্গের রীতি-নীতি, সংস্কার ইত্যাদি নিম্নবর্ণের মানুষদের আলাদা করে রেখেছে। ফলে নিম্নবর্ণের মানুষদের দেবদেবী ও নিম্নশ্রেণির মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই নিম্নবর্ণের মানুষরা উচ্চবর্গের চাপানো রীতি-নীতি, সংস্কার এক কথায় ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য 'কলমা পড়ে' মুসমান হয়ে যায়। কারন সেখানে কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামি নেই। অর্থাৎ মহাশ্বেতা দেবী আলোচ্য উপন্যাসে নতুনভাবে নবরূপে মধ্যযুগীয় যে উপাদান ব্যবহার করে তৎকালীন সময়ের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন।

আলোচ্য উপন্যাসে গৌণ চরিত্র চৈতন্য। বটুই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। তাই বটুর মধ্য দিয়েই অনেক বাস্তব সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে বটু নিজেই সমাজের নানা সংস্কারকে ভালো করে দেখার জন্য ঘর ছেড়ে ছিল। তাই তো উপন্যাসের শেষ পর্বে বটুর উক্তিই প্রণিধানযোগ্য— *"পৃথিবী কত বড়ো আমি দেখে নেব। অনেক পাপ, অনেক অনাচার, দেবতা হব না আমি। মানুষ হয়েই দেখে নেব সব।''* [৫১]

বটুর এই উক্তিটি প্রমাণ করে যে, মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার নিগড়ে প্রোথিত পরিবেশ ও জনসাধারণ যেভাবে আসক্ত হয়ে পড়েছে, তা দেখার জন্যই বটুর দেবতারূপে পরিবর্তন। কিন্তু সে দেবতা হয়ে নয়, মানুষ হয়েই সমাজকে দেখতে চেয়েছিল। তাই সে উপরিউক্ত কথাটি বলেছিল, অর্থাৎ মহাশ্বেতা বটুর মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের উপাদানের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন, এবং সেই সঙ্গে ষোড়শ শতকের প্রচলিত, আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করে সেই সময়ের পরিবেশ রচনা করেছেন।

মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন বলেই, তাঁর 'বেনেবউ' (১৯৯৪) উপন্যাস-এ মধ্যযুগীয় জীবনধারার বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিনি এই উপন্যাসটি রচনা করার সময় মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটির কথা উল্লেখ করেছেন। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটিই তার উপন্যাস রচনার প্রধান অবলম্বন

হিসেবে উঠে এসেছে। সেই সঙ্গে আলোচ্য উপন্যাসে স্থান পেয়েছে একাদশ বঙ্গাব্দের বেনে সমাজের জীবন কথা ও দামিন্যার সময় ও পরিসরে বাংলার বেনে সমাজের প্রান্তিকায়িত নারীর অবস্থা। মধ্যযুগীয় এই প্রেক্ষাপটে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ নারী পরিসরের অবস্থান ব্যক্ত করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই উপন্যাসে উঠে এসেছে বহু বিবাহ প্রথা, সতীন সমস্যা, বাল্যবিবাহ, তন্ত্র-মন্ত্র, অন্ধ সংস্কার ইত্যাদির প্রসঙ্গ। মধ্যযুগীয় ভাব-পরিমণ্ডলের নানা উপাদানে আলোচ্য উপন্যাসটি বিশিষ্ট পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ফলে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর এই উপন্যাসে মধ্যযুগীয় উপাদানের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি তার উপন্যাসের কাঠামো গঠন করেছেন।

'বেনেবউ' উপন্যাসটি রচনা করার সময় কবি কঙ্কন মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজেই এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের ভূমিকা অংশে বলেছেন—

"বেনেবউ কাহিনির মূলে আছেন ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। এই কবির কাছে আমি বারবার ফিরে ফিরে আসি। 'ব্যাধখণ্ড' ও 'বেনেবউ' তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' থেকেই উৎসারিত।'"[৫২]

মহাশ্বেতা দেবী মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে আধুনিক যুগের সময়কে ধরতে চেয়েছেন। উপন্যাসের কাহিনিটি মুকুন্দরামের ছায়া অবলম্বনে রচিত। মধ্যযুগীয় ধর্ম ভিত্তিক কাব্যকে আধুনিক উপন্যাসে রূপান্তর করাই ছিল ঔপন্যাসিকের প্রয়াস। মুকুন্দরাম চরিত্রটি আলোচ্য উপন্যাসের এক বিশিষ্ট চরিত্ররূপে রূপায়িত হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে লক্ষ করা যায়, 'চণ্ডীমঙ্গলের' কাহিনিই, যেখানে নিঃসন্তান ধনপতি সওদাগরের পুত্র কামনায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করা, বিদেশে বাণিজ্য যাত্রা; দুই বোন, সতীনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, খুল্লনার উপর লহনার উৎপীড়ন ও অত্যাচার। তবে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দেবীর কৃপায় শেষ পর্যন্ত সবকিছু ভালো ভাবে ঠিকঠাক হয়ে গেছে। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে তা হয় নি, উপন্যাসের পরিণতি হয়েছে বাস্তব সম্মতভাবে

অমোঘ পরিণামের দিকে।

উপন্যাসে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন যে, পুত্রার্থে পুরুষের বহুবিবাহে নারীর অবমূল্যায়ণ। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক অতীত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সমকালের ইতিহাস গড়তে চেয়েছেন। উপন্যাসের ভূমিকা অংশে তিনি বলেছেন— *"'বেনেবউ' এর কাহিনী সম্ভবত আজও প্রাসঙ্গিক। আইন উপেক্ষা করে এখনো সমাজে বহু বিবাহ চলছে। স্ত্রী ত্যাগ আখছার ঘটে, তবে এ ঘটনার পর নিচের তলার সমাজে মেয়েরা খাটতে বেড়িয়ে পড়ে। ওপর তলার সমাজে এসব ঘটনার পরিণাম অন্যরকম হয়। আর 'ছেলের মা' না হতে পারলে তো আজও বিবাহিতা মেয়েরা অপরাধীভাবে নিজেকে। কন্যাভ্রূণ বিনাশ নিচের তলার সমাজে বিরল। অর্থাৎ এখনো আমরা একই সঙ্গে বিংশ শতকে ও অন্যান্য বিগত শতকে বাস করি।"* [৫৩]

মহাশ্বেতা দেবীর এই উক্তির মধ্য দিয়েই যে সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, তারই সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে মধ্যযুগীয় উপাদানের প্রয়োগের দ্বারা আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে। মহাশ্বেতা দেবী আধুনিক যুগে দাঁড়িয়েও অতীত সময়কে হাতিয়ার করে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অতীতের কাহিনি, সামাজিক অবস্থার নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন—

"মহাশ্বেতাও বিশিষ্ট অর্থে ঐতিহাসিক বা ইতিহাস দার্শনিক যিনি যথাপ্রাপ্ত অতীতকে বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করেন না এবং মনে করেন না কখনো, সেই অতীতের সত্য একবাচনিক, একরৈখিক ও কেন্দ্রাভিগ। ফলে মহাশ্বেতার ইতিহাসবোধ স্বভাবে পুরোপুরি বিনির্মাণপন্থী।" [৫৪]

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র গণপতির সন্তান না হওয়ার জন্য, সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে চৌদ্দ বছরের এক বালিকাকে। তার নাম অহনা। অহনা হল গণপতির প্রথম স্ত্রী কনকার সম্পর্কে মামাতো বোন। মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহ, এক প্রাচীন রীতি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই গণপতি সন্তানের আশায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করে অহনাকে। কিন্তু উপন্যাসে অহনার প্রতি কনকার উৎপীড়ণ,

অত্যাচার, খেতে না দেওয়া ইত্যাদি মধ্যযুগের পারিবারিক ক্ষেত্রে সতীন সমস্যার বাস্তবস্বরূপটিকেই পরিস্ফুট করে তোলে। সতীনের জ্বালা ও সন্তান না হওয়ার যে কত বড় জ্বালা, তা মুকুন্দের বউ অহনা ও কনকাকে দেখে বুঝতে পারে বলেই সে বলে— *"সকল মেয়েরে সধবা রেখো কোলেকাঁখে ছেলেমেয়ে দিও। সতীনের জ্বালা দিওনা ঠাকুর।"*[৫৫]

মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান যে প্রান্তিকায়িত, তা উপন্যাসের মধ্যে স্পষ্ট ধরা পড়ে। মহাশ্বেতা দেবী মধ্যযুগীয় উপাদান ব্যবহার করে আলোচ্য উপন্যাসে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটকেই ধরতে চেয়েছেন। তাই তো উপন্যাসে মুকুন্দের স্বগোতোক্তিতেই ধরা পড়েছে সমাজের অবস্থার কথা— *"একাধিক বিয়ে দেশাচার অহনা, বউ বাঁজা হোক বা পুত্রবতী, সতীন আনে স্বামীরা। কিন্তু এ দেশাচার যে কত নিষ্ঠুর, ওই বিহ্বল আর্ত, বালিকার চোখ বলে দিচ্ছে।"*[৫৬]

অর্থাৎ অহনার মধ্য দিয়েই সমাজে আর পাঁচটা নারীর পরিচয়টি রূপায়িত হয়েছে। অহনার মতো অন্যান্য মেয়েদের অবস্থার কথা চিন্তা করতে গিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা যে নিজেদের বংশ মর্যাদা রক্ষার জন্য সতীনের হাতে নিজের মেয়েকে তুলে দেন, সে কথাই মুকুন্দরামের ভাবনায় উঠে এসেছে—

"দুধে সরে মানুষ করে অহনাদের বাবারা স্বচ্ছন্দে সতীন ঘরে বিয়ে দেয় ওদের। এমন তো হয়ই সমাজে। সতীনরা অহনাদের মারে ছেঁচে, কষ্ট দেয়। কখনো সতীন, কখনো শাশুড়ি, কখনো ননদ। অহনারা জলে ঝাঁপ দেয়, গলায় দড়ি দেয়, বিষ খায়।... এতো দেশাচার, এতো চলে আসছে।... এ রকম তো ঘটেই সমাজে।"[৫৭]

মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থান, তাদের সামাজিক অধিকার সবই পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার অন্তর্গত। মুকুন্দরামের ভাবনার মধ্য দিয়ে সমাজের বাস্তব সমস্যার স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং সেই সঙ্গে নারীর সামাজিক অবস্থানও চিত্রিত হয়েছে। অর্থাৎ মহাশ্বেতা দেবী মুকুন্দরামের মধ্য দিয়ে সতীন সমস্যা যে মধ্যযুগীয় সমাজ এ কত বড় সামাজিক ব্যাধি ছিল, তার প্রকাশ ঘটেছে মুকুন্দের

ভাবনায়—

"নিম তিতা, নিসুন্দা তিতা, তিতা মাকাল ফল
সবার অধিক তিতা কন্যা, বোন সতীনের ঘর।"[৫৮]

এরই পাশাপাশি আলোচ্য উপন্যাসের পুকুরঘাটে মেয়েদের কথাবার্তার উল্লেখের মধ্যে সতীনের সন্তানকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলা, আতাপিসির আগের জীবন বর্ণনায় এক বৃদ্ধের সঙ্গে আতাপিসির বিয়ে ও পরিণামে শেষ পর্যন্ত বৈধব্য, এক অল্প বয়সের মেয়ের সঙ্গে সুধন্য আচার্য্যের বিয়ে, এবং বিয়ের আগে অহনার কথাবার্তায় নানা ঘটনার উল্লেখের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে মধ্যযুগীয় ভাব পরিমণ্ডলের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থানের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমাজ বিভিন্ন বিশ্বাস, সংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকায় সতীন সমস্যা, বাল্যবিবাহ প্রথা, বুড়ো পাত্রের সঙ্গে অতি অল্প বয়সের মেয়ের বিয়ে দেওয়া, চৌদ্দ বছর বয়েসের মেয়ের বিয়ে না হলে সমাজে এক ঘর হওয়ার ভয়, তাছাড়া সেই মেয়ের নামে কুৎসা রটনা ইত্যাদি সবই মধ্যযুগীয় উপাদানের সংমিশ্রণে নবরূপে আলোচ্য উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী আধুনিক যুগে দাঁড়িয়েও অনেকটা পিছিয়ে গেছেন। সমাজের বাস্তব সমস্যার শিকড় খোঁজার জন্য। তাই তিনি মধ্যযুগের ইতিহাসকে পর্যবেক্ষণ করে, সেই সমাজ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আলোচ্য উপন্যাসের অবয়ব তৈরি করেছিলেন।

মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় নারীদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না, তার পরিচয় পাওয়া যায় আলোচ্য উপন্যাসের অহনা চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। অহনা চরিত্রটি উপন্যাসে নিপীড়িত, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, শোষিত নারীর প্রতি মূর্ত রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। তাই তো গণপতির সঙ্গে বিয়েতে অহনা রাজি না হলেও, শেষ পর্যন্ত অহনাকে বাধ্য করা হয়েছিল গণপতির সঙ্গে বিয়ে করতে। ফলে অহনার কথাতেই ধরা পড়ে সেকালের সমাজের বাস্তবচিত্র ও পুরুষতন্ত্রের প্রতাপের স্বরূপ—

"আর ছেলে না হলে আরেকটা অহনা আনবে, তার তো ছেলে চাই। তার

ছেলে চাই সতীনের দাসী চাই...আমারে পার না করলে বাবার নাকি অনন্ত নরকবাস হবে, নিয়ম! তাই ভাবি, ডোম-ডোমনী, জেলে-জেলেনী, বেদে-বেদেনী, সাপুড়ে, বাজিকর, এরা বেশ আছে। দুধের মেয়ের বিয়ে নেই। স্বামী-স্ত্রী পথে-ঘাটে কেমন ফিরে, কোন নিন্দা হয় না। মেয়েরা, যাকে মন লয়, তার গলেই মালা দেয়।'[৭৫৯]

অহনার এই উক্তির মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যের পাশাপাশি উচ্চবর্গ বনাম নিম্নবর্গের সমাজের সামাজিক অবস্থাও চিত্রত হয়েছে। আর সন্তান হীনতার জন্যই যে সেকালের সমাজে পুরুষের একাধিক বিবাহ স্বীকৃত ছিল, এর ফলেই অনেকে অতি অল্প বয়সের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা কন্যাদায় থেকে মুক্ত হতেন। সন্তানের জননী যদি নারী না হতে পারে, তাহলে তার কোনও সামাজিক মূল্য থাকে না সমাজে। কনকা চরিত্রটির মধ্য দিয়ে এই দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সন্তানহীনতার জন্য সমাজে স্ত্রীকে *"বাঁজা, আটকুড়া'*[৭৬০] বলে অভিহিত করা হত। সন্তানের জননী না হতে পারলে, সমাজ নারীকেই দোষারোপ করত। সন্তান না হওয়ার জন্য পরিবারে শশুড়ি এবং স্বামীর কাছ থেকে যাতনাই সহ্য করতে হয়েছিল কনকাকে— *"শশুড়ির গাল, আর স্বামীর হাতে চড়-চাপড়, এ ছিল কণকার নিত্য পাওনা।'*[৭৬১]

শুধু সন্তান না হলে মধ্যযুগের সমাজে নারীরাই যে অপদস্ত হত তা নয়, সেই সঙ্গে পুরুষরাও সমাজে অপদস্ত হত, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়, আলোচ্য উপন্যাসে। গণপতির কোনো সন্তান না থাকায় তারও সমাজে মর্যাদাময় আসন ছিল না। ভিক্ষুকরাও পর্যন্ত তার ঘর থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করতে যেত না। ঔপন্যাসিক বাচনে এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

"গণপতি ভিখারি-বাউল-বোষ্টমকে প্রথম ভিক্ষা দিতে চায়। আটকুঁড়োর ঘর থেকে কোন ভিক্ষার্থী দিনের প্রথম ভিক্ষা নেয় না। পাড়াপড়শী প্রাতঃকৃত্যের জন্য মাঠে গেলে গণপতির দিকে পিছন ফিরে হাগতে বসে। এ দুঃসহ সামাজিক অশ্রদ্ধা থেকে গণপতি বাঁচতে চায়।'[৭৬২]

অর্থাৎ মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থায় সন্তানহীনতার জন্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যে সামাজিক যন্ত্রণায় জর্জরিত হতে হত, তারই চিত্র এখানে ফুটে ওঠে। এই সামাজিক সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অনেক সন্তানহীন স্ত্রী তাদের স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে রাজি হতেন। আলোচ্য উপন্যাসে কনকাও সন্তানহীনতার জন্য এবং সমাজের ভয়েই স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে রাজি হয়েছিল। সমাজে একঘরে হওয়ার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কনকা তার স্বামীর বিয়ে দিয়েছিলেন অহনার সঙ্গে। ঔপন্যাসিক বাচনে কনকার সমাজ ভয়ের দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।— *"কনকা বুঝল, বন্ধ্যা মেয়ে-ছেলে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে সম্মতি না দিলে সমাজে সে কারো সমর্থন পাবে না।"*[৬৩]

গণপতি অহনাকে বিয়ে করে কনকার জন্য সতীন আনলেন। বিয়ের কিছু দিনপর গণপতি ব্যবসার জন্য বিদেশে যাত্রা করলেন। এখানে মহাশ্বেতা দেবী 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'বণিক খণ্ডের' ধনপতি সওদাগরের ছায়া অবলম্বনে গণপতির চরিত্রটিকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু এরই মধ্যে সব ভালোভাবে চললেও যে মধ্যযুগীয় সমাজের সংস্কারের বিচিত্র রূপ যথা— তন্ত্রমন্ত্র, তুক্-তাক-এর বিষয়টিই উপন্যাসের কাহিনিপটে পরিবর্তন আনে। গণপতির বালিশের ভেতরে যে একটি লাল কাপড়ের 'পুঁটলি' পাওয়া গিয়েছিল, সেটিই অহনার জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। সেই কাপড়ের পুঁটলিটি নিয়ে কনকা তেগুনার কাছে গিয়ে জানতে পারে যে, এটি হল তার (কনকার) 'মৃত্যুবাণ'। ফলে বাড়ি ফিরে এসে কনকা— *"ঘুমন্ত অহনার চুল ধরে তাকে মাটিতে ফেলে কনকা, ঝাঁটা দিয়ে মারতে থাকে।"*[৬৪]

অর্থাৎ তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় তন্ত্রমন্ত্র, তুক্-তাক, বশীকরণ ইত্যাদিকে সামাজিক সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেছিল। আলোচ্য ঘটনায় সেদিকটিরই ইঙ্গিতবাহী।

অহনা ও কনকার মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ধরে মূলত মধ্যযুগীয় অন্ধ সংস্কারের বশবর্তী হয়েই। আলোচ্য উপন্যাসের পরিণতিতে কনকার অত্যাচারে মৃত্যু ঘটে

অহনার এই অন্ধ সংস্কারের বশবর্তী হয়েই।

মহাশ্বেতা দেবী মুকুন্দরামের কাব্যে চণ্ডীপূজার মাঙ্গলিক প্রসঙ্গটি একেবারেই গুরুত্ব না দিয়ে তার ভেতর থেকে বের করে এনেছেন দীর্ঘকালের জমে থাকা মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক-সামাজিক ইতিহাসের চিত্র। বাস্তব ক্ষেত্রে অসহায় মুকুন্দ তাঁর কল্পনার কাহিনিতে দৈবী-মহিমার অলৌকিকত্ব নির্মাণ করেন। বাস্তবক্ষেত্রেও এই সতীন সমস্যা বিষয়ে দেশাচার ও লোকাচার বলে মুকুন্দ নিজেও অসহায় ছিলেন। তাই বলেন— *"সত্যিই দামিন্যায় আমরা অমানুষ বটি।"*[৬৫]

সতীন সমস্যার প্রত্যক্ষদর্শী অথচ অসহায় চরিত্ররূপে মুকুন্দ চরিত্রটিকে উপস্থাপিত করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিক। বারোটি পরিচ্ছদে বিন্যস্ত এই উপন্যাসের স্থান-পট দামিন্যা; দামিন্যা ত্যাগের আগের সময়ে ষোড়শ শতক, স্বাভাবিকভাবেই উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে এসেছে এই শতকের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি। ফলে মহাশ্বেতা দেবী মধ্যযুগীয় সমাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে গ্রহণ করে তাকে নবরূপে তাঁর আধুনিক উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। যার ফলে তাঁর উপন্যাসটি মধ্যযুগীয় উপাদানের নবরূপায়ণে উপস্থাপিত হয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবীর প্রতিটি লেখার মধ্যেই ইতিহাসের গভীরতার দিকটি ওঠে আসে। ইতিহাসের প্রতি গভীরভাবে আগ্রহী বলেই তিনি তাঁর 'ব্যাধখণ্ড' (১৯৯৪) উপন্যাস রচনা করার সময় মধ্যযুগীয় জীবনধারার প্রতি নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁর এই উপন্যাস রচনা করার সময় মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটির কথা উল্লেখ করেছেন। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটি তাঁর উপন্যাস রচনার প্রধান অবলম্বন হিসেবে উঠে এসেছে। সেই সঙ্গে আলোচ্য উপন্যাসে স্থান পেয়েছে ব্যাধ-শবরদের জীবন কথা। মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসে মধ্যযুগীয় উপাদানের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' থেকে উপাদানের সংগ্রহ করে তিনি তাঁর উপন্যাসের কাঠামো তৈরি করেছেন।

'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসটি রচনা করার সময় কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটির কাছে ঋণের কথা মহাশ্বেতা দেবী স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি নিজেই উপন্যাসের সূচনা অংশে বলেছেন—

"ব্যধজীবন সম্পর্কে মুকুন্দরামের অন্তরঙ্গ পরিচয় তো তাঁর 'অভয়ামঙ্গল' পাঞ্চালীর 'ব্যাধখণ্ড' অংশেই বিবৃত। আমার এ লেখা একান্তই উপন্যাস। মুকুন্দরামের কাব্য এর আকর, কিন্তু শবর জীবন লেখার সময়ে আমি (১) তাঁর গ্রন্থ + (২) আমার সামান্য জানাজানি + (৩) আমার অনুসন্ধেয়, তিনটি মিলিয়েছি।'[৬৬]

মহাশ্বেতা দেবী মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে আধুনিক যুগের সময়কে ধরতে চেয়েছেন। কারন সমাজে যারা নিম্নবর্গ বলে পরিচিত সেই সমাজের রীতি-নীতি, চাল-চলন অর্থাৎ সেই নিম্নবর্গ সমাজের সাংস্কৃতিক ও জীবনাচরণের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য উপন্যাস রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। কারন লোধা-ব্যাধ-শবর এই শ্রেণির মানুষদের কথা যারা লেখে না, যাদের কথা ভাববারও কেউ নেই। সেই সকল নিশ্চিহ্ন মানুষদের কথাই তাঁর উপন্যাসে জায়গা করে নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই আলোচ্য উপন্যাসের ভূমিকা অংশে বলেছেন—

"এ উপন্যাসে আমি শবরদের জাতি পরিচিতি অনুসন্থানের কাজে প্রথম ব্রতী হলাম। ব্যাধ বা শবর জীবনের বিষয়ে যা যা লিখলাম, তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির সমর্থন নিশ্চয় মিলবে ওদের কাছ থেকেই, যেদিন ওরা বিতাড়িত, অত্যাচারিত, অপমানিত হবে না।'[৬৭]

'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসের সূচনা বিন্দু হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি শবর জাতির সংকট মুহূর্ত। যেখানে শহরায়তন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য জীবনের ধ্বংস সাধন। আতঙ্কগ্রস্ত জন-জীবনের জীবনধারাকে আলোচ্য উপন্যাসে নয়টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের মতই এই উপন্যাসে মুকুন্দরামের জীবনধারার শিল্পীতকরণ ঘটিয়েছেন। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে লক্ষ করা যায় যে, মামুদ শরীফের অত্যাচারে গ্রামকে গ্রাম ব্যাধিগ্রস্ত। মকুন্দরামকেও সেই অত্যাচারের বলি

হতে হয়েছে। যার ফলস্বরূপ তার পৈতৃক 'ভিটেমাটি' 'দামিন্যা' গ্রাম ত্যাগ করতে হয়েছে এবং আশ্রয়ের সন্ধানে যেতে হয়েছে আরড়ায়। এখানে এসে তাঁর পরিবারের সব দুঃখ ঘুচে গেল। আলোচ্য উপন্যাসেও আমরা একই ঘটনার পুনরালোচনা দেখি। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী 'চণ্ডীমঙ্গলের' আধারে উপন্যাসটি রচনা করলেও তাঁর নিজস্ব হৃদয় রসে জারিত হয়ে উপন্যাসটির নবরূপায় ঘটিয়েছেন।

আলোচ্য উপন্যাসের মুকুন্দ দামিন্যা থেকে উৎখাত হয়ে আরড়ায় এসে এক সম্পন্ন গৃহস্থে রূপান্তরিত হয়েছে, উপন্যাসের শুরুতেই এর পরিচয় আমরা পাই—

"আরড়ায় এসে আর দুঃখ নাই, কী বলো? উঠানে হামার ভরা ধান, গোহালে গরু, ভালো আছি।"[৬৮] তবুও মুকুন্দের মনে পড়ে তার ভালোবাসার জায়গা 'দামিন্যা' গ্রাম। তার মায়ের কথা মনে পড়ে, যে মায়ের বত্রিশ নাড়ির মধ্যে সে বাঁধা ছিল। যে মায়ের আদর ছাড়া তার ঘুম আসত না। কিন্তু মানুষের লোভ-লালসা-ক্ষমতার দাপটে তাকে তাঁর সাধের 'দামিন্যা' গ্রাম ত্যাগ করতে হয়েছে। তাঁর মনে পড়ে—

"তাদের স্থাপিত দেবপূজা, গৃহদেবতার পূজা,গ্রাম দেবতার পূজা, আর জমিজমার তদারকি!"[৬৯] দামিন্যায় মুকুন্দরা অনেক সুখে-শান্তিতে ছিল। কিন্তু এখন অতীতকে স্মরণ করা ছাড়া আর কিছুই তার কাছে অবশিষ্ট নেই। কারন মানুষ প্রাচীন সংস্কার ও প্রাচীন মূল্যবোধের ফলে সংকটাপন্ন। পুরোনো রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, সমাজ সংস্কার সব পরিবর্তন হয়ে নতুন বিভঙ্গ এসে তার উপর আছড়ে পড়েছে। ফলে বদলে গেছে সময়ের সাথে সাথে পুরোনো রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, সমাজ- সংস্কার সবকিছুই সময় তার উপর নতুন মোহর লাগিয়ে দিয়েছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারার জন্য অনেক মানুষই তার সাজানো সংসার, স্নেহের বাঁধন ভিটেমাটি ছেড়ে চলে গেছে এক অজানা আশ্রয়ের সন্ধানে।

আলোচ্য উপন্যাসে লক্ষ করা করা যায় যে, 'চণ্ডীমঙ্গল'এর রচয়িতা মুকুন্দরামের মত উপন্যাসের মুকুন্দও অত্যাচার, উৎপীড়ন থেকে বাঁচার তাগিদে পৈতৃক ভিটে মাটি 'দামিন্যা' ত্যাগ করে আরড়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার বিস্তৃত পরিচয়কে তুলে ধরেছেন। যেখানে প্রজারা মামুদ শরীফের অত্যাচারের বলি হয়েছিল। প্রজাদের কাছ থেকে জোর করে কর আদায়, অনুর্বর জমিকে উর্বর জমি করে লিখে নিয়ে কর আদায় করা হত। আর কোণাকুণি দড়ি ফেলে পনোরো বিঘা (কাঠা) জমিকে কুড়ি বিঘা (কাঠা) জমি হিসেবে প্রজাদের কাছ থেকে যেভাবে খাজনা আদায় করা হয়েছিল সেই একই রূপেরই একটি চমৎকার দৃশ্য আলোচ্য উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে গণেশের উক্তির মধ্য দিয়ে—

"কোণাকুণি রশি ফেলে মাপা? আজ নন্দীদের জমি মাপছে। কাল তোমার, পরশু যশ ঠাকুরের। বাপরে, পিশাচ বটে? কোণে কোণে দড়ি ফেলো, কুড়ি কাঠায় কুড়া (বিঘা) হবে না। পনেরো কাঠাকেই বিশ কাঠা বলে দেখাবে।'' [৭০]

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার-এ এক অদ্ভুদ ধরণের শোষণ প্রক্রিয়া। যার ফলে প্রজাদের সর্বস্ব লুঠ হয়ে যায়। যার দেনা মেটাতে মেটাতে প্রজাদের শেষ সম্বল ঘরের ঘটি-বাটি পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যায়। এ ধরণের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রজারা দেশ ছেড়ে পালায়। উপন্যাসে মুকুন্দকেও এজন্য 'দামিন্যা' গ্রাম ত্যাগ করতে হয়েছিল। আর স্ত্রী—সন্তানদের নিয়ে নতুন করে সংসার বাঁধতে হয়েছে আরড়া গ্রামে। মুকুন্দ নিজের আশ্রয়ের সন্ধান আর বাঁচার তাগিদেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করে।

বাস্তব ও কল্পনার এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে। উৎপীড়িত, বেদনাক্লিষ্ট, অসহায়, শোষিত, নিপীড়িত মানুষের এক পরিপূর্ণ রূপকে আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসটিকে মহাশ্বেতা দেবী এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যে, তা মধ্যযুগের কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম রচিত 'চণ্ডীমঙ্গলের' দ্বিতীয় সংস্করণ। অর্থাৎ মহাশ্বেতা দেবী আলোচ্য উপন্যাসে মধ্যযুগীয় উপাদানের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন। উপন্যাসে লক্ষনীয় যে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মুকুন্দের জন্ম নব জন্মের বার্তায় উদ্বুদ্ধ। মধ্যযুগের বিখ্যাত মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর মত উপন্যাসের

মুকুন্দের লেখনিতে কালকেতু ও ফুল্লরার নবজন্ম ঘটেছে। নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্নের সাথে সাথে তাদের অপরিমিত সাহসের জন্ম হয়, তা যেন মধ্যযুগকেও হার মানায়। বাস্তবিক অর্থে মহাশ্বেতা দেবী এমন এক আখ্যান তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যারজন্য তাকে কোনো দায়বদ্ধতার সীমানাতে থাকতে না হয়। তাঁর চিন্তা-চেতনার এক পরিকল্পনাধর্মী বাস্তব আখ্যান তৈরি হয়েছে 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসের মাধ্যমে। আদিবাসী সমাজ জীবনের তথ্য ইতিহাস নির্ভর। আর এই ইতিহাস নির্ভর তথ্যকে সজ্জিত করে তাঁর উপন্যাসের কাঠামো গঠন করেছেন। অর্থাৎ মহাশ্বেতা দেবীর চিন্তা-চেতনা-কল্পনার বাস্তব রূপায়ণে মধ্যযুগের সময়ের এক নতুন রূপ তুলে ধরেছেন 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসে।

উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে যে, সময়ের সাথে সাথে কাল্যা (কালকেতু) ও বড় হচ্ছে, তার শরীরের গঠন যেন প্রকৃতির দান। এ প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী লিখেন—

"কাল্যার চেহারা কালো পাথরে তৈরি অর্জুন যেন। কাঁধ অবধি চুল ওর। এই গোঁফ। ঘার উলটে ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে ও হা হা করে হাসল।'"[৭১]

কাল্যার শরীরের গঠন কালকেতুর কথা মনে করিয়ে দেয়। যে কালকেতু কাউকে ভয় করত না, কোনো জীবকে হত্যা করতে পিছু হটত না। আলোচ্য উপন্যাসেও আমরা কাল্যার সাহস ও বীরত্বে পরিচয় পাই। যেখানে মাত্র পনেরো বছর বয়সেই সে বাঘ মেরে রাজার কাছ থেকে উপহার স্বরূপ একজোড়া কাপড়, দুটো গামছা পেয়েছিল। কাল্যা ছিল জীবন্ত ও প্রাণবন্ত প্রকৃতির এক সাধারণ ব্যাধ সন্তান। কাল্যাকে মহাশ্বেতা দেবী ব্যাধ-শবর জীবন থেকে বাইরের গোলমাল জগত নিয়ে আসেন নি। কাল্যাকে তাঁর লেখনির স্পর্শে বাস্তবিক জীবন ছন্দে এনে দাঁড় করিয়েছেন। 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর কালকেতুর ছায়ায় কাল্যার চরিত্রের চিত্রায়ণ করা হয়েছে। সে বীর, অসহিষ্ণু ও ভালোবাসা আছে। তাই জীবন সংগ্রামে প্রতিটি পর্যায়ে সে ধাপে ধাপে পৌঁছায় এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে। সে যেমন তার শক্তির অপব্যবহার করে, আর সেই অপব্যবহারের কথাও তাঁর মুখ দিয়ে শোনা যায়—

"—পাখিগুলো মারবে?

— মারব না? মাংস, পালক বেচে চাল নিব, তেল নিব খেতে হবে না?

— এতো জীব হিংসা।

কাল্যা বলল, তুমি আমি কি এ নিয়ম সির্জেছি? অভয়াচণ্ডী তোমাদের দিয়েছে পূজো, পুঁথি, হামার, গোহাল! আমাদের দিয়েছে জঙ্গল। আমরা শবর হে, জঙ্গলের সন্তান!'' [৭০]

কাল্যার এই কথার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার যে উচ্চবর্গ ও নিম্ন বর্গের ভেদাভেদ ছিল সমাজজীবনে তার পরিচয়টি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ ব্যাধ-শবর জন-জাতিরা অপরিমিত সাহসের সাথে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হয়। এটিই বিধাতার লেখা বলে তারা ধরে নেয়। মহাশ্বেতা দেবী কাল্যার চরিত্রের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় সামন্তব্যবস্থার স্বরূপটিকে আধুনিক সময়োপযোগী করে তুলেছেন। যার ফলস্বরূপ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ব্যাধ-কালকেতুর জীবন। এই প্রসঙ্গেই উপন্যাসে উঠে এসেছে অরণ্যচেতনা ও ইতিহাসের সময়োপযোগী বাস্তব সত্যের চিত্র।

'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসটি মধ্যযুগীয় সময় ও পরিসরের আধারে রচিত হলেও তা বর্তমান যুগকে বিশেষ করে শবর জাতির সংকটের কথাকেই তুলে ধরে। যে জাতির এক সময় সংস্কৃতি গৌরবমণ্ডিত ছিল, যারা এক সময় সমাজের ধারক ও বাহক ছিল। কিন্তু তাদের এই গৌরবমণ্ডিত সময় আর নেই, তারা প্রায় বিস্মৃত হয়ে পড়েছেন। সেই জনসমাজের প্রতি নিজের বিশ্বাস ও কল্পনার হৃদয়ের রঙ মিশিয়ে 'চণ্ডীমঙ্গলে'র আধারে এক বাস্তব আখ্যানকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের মধ্যে নিত্যদিনের জীবন প্রবাহকে সামগ্রিক ভাবে খুঁজে না পাওয়া গেলেও পাঠকের মনের অনুভূতিতে তার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে' শ্রেণি বিভক্ত সমাজের স্পষ্ট চিত্র লক্ষিত

হয়। মধ্যযুগের কবিরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে অর্থাৎ উচ্চ-নীচ ভেদাভেদহীন এক আদর্শ সমাজব্যবস্থার কল্পনা করেছেন। সেই কল্পনারই সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে মহাশ্বেতা দেবীর 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসে, কারন মধ্যযুগীয় কবিদের কামনার সার্থক রূপায়ণ ঘটাতে গিয়ে তিনি তার উপন্যাসে যে আরড়া গ্রামের উল্লেখ করেছেন, সেই গ্রামে বিভিন্ন জাতির বসবাসের যে পরিচয়কে তুলে ধরেছেন, তার মধ্যে দিয়ে তিনি মধ্যযুগীয় ধারণাকে বর্তমান যুগের ধারণায় মিশিয়ে দিয়েছেন—

"আরড়া দৈর্ঘ্যে চার ক্রোশ, প্রস্থে দুই ক্রোশ, এ কারণে যে একেক জাতের একেক পাড়া।... মুসলমানদেরও পাড়া আছে, যদিও তারা বিশ ঘর মাত্র।

নগরের সমৃদ্ধ জায়গায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য পাড়া। এছাড়া গোয়ালা, কুমোর, কামার, তাঁতি, কলু, ছুতোর, এদের পাড়া আছে। অন্ত্যেবাসী তারা, যারা আরড়ায় জীবিকার জন্য আসে কিন্তু থাকে নগরের প্রান্তে।"[৭৩]

অর্থাৎ লক্ষণীয় যে, 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসের মধ্যে প্রত্যেক জাতি আলাদা আলাদা অবস্থান করলেও প্রত্যেকেই একই গ্রামে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করছে। যাদের উপর উচ্চবর্গের কোনো শোষণ-উৎপীড়ণ-অত্যাচারের পরিচয় নেই।

'চণ্ডীমঙ্গল'-এর কালকেতু যে গুজরাট নগর পত্তন করেছিলেন, যেখানে সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণ বর্গের মানুষদের বসবাসের জন্য অভয় দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ কালকেতুর 'গুজরাট নগর পত্তন' সামন্ততান্ত্রিক আদর্শে গঠিত সমাজ ব্যবস্থার ইঙ্গিতবাহী। এই উপাদানকেই কাজে লাগিয়েই মহাশ্বেতা দেবী তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন জাতি-ধর্ম পেশার মানুষের বসবাসের পরিচয়টি তুলে ধরেছেন।

কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে শবরদের অবস্থান গ্রামের বাইরে বলা হয়েছে, তারা অরণ্যের অদিবাসী— *"শবররা তো বনের কোলে বাস করে।"*[৭৪] সমাজে তারা নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বহারা। তাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দুর্বলতা তাদের অন্ধকারে নিয়ে যাচ্ছে। তবু তারা কোনোমতেই অধীনতা মেনে নেবে না। আসলে এরা অরণ্যকে কেন্দ্র করে জীবন অতিবাহিত করে— *"টাকা কী বস্তু জানেও না, দেখেও না।"* [৭৫]

শিকার বা অরণ্যের ওপর নির্ভর করেই তারা জীবন নির্বাহ করে। তাদের চাওয়া ও পাওয়ার জগৎ নির্দিষ্ট গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ বলেই অরণ্য সন্তানরা অরণ্যকে নিয়েই বেঁচে থাকে। কারণ — *"ওরা অভয়াচণ্ডী পূজে? অভয়াচণ্ডী ...বনচণ্ডী ..দুর্গাষ্টমীতে পরব, বিজয়া দশমীতে পরব করে বনে যেয়ে।''* [৭৬]

এই অভয়া চণ্ডী ও অরণ্যকে কেন্দ্র করেই তারা বাঁচতে চায়, বাইরের পরিবেশের মানুষদের সাথে তারা এক হয়ে উঠতে পারে না। এখানেই মহাশ্বেতা দেবী মধ্যযুগীয় কাব্যের আধারে যুগের বাস্তব চিত্রটিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই নিম্নবর্গের মানুষরা সমাজ থেকে বঞ্চিত, শোষিত উৎপীড়িত। তাদের মুক্তির কোনো পথ নেই। এই কথাগুলো বলার জন্যই তো লেখক এক নিজস্ব কথন ভঙ্গি তৈরি করে নিয়েছেন আলোচ্য উপন্যাসের মাধ্যমে।

সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে মহাশ্বেতা দেবী বাংলা কথাসাহিত্যে যে বিশেষ দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন, তার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে দেখানো হয়েছে যে, চরম সংকটের মধ্যে নিম্নবর্গের মানুষরা উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। তারা তাদের সবকিছু ফেলে রেখে চলে যেতে চায়, চলেও যায় অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে। বহু দূরে তারা চলে যায় অন্য এক অরণ্যের খোঁজে। অরণ্য ছাড়া যে তাদের আর অন্য কোনো গত্যন্তর নেই, তার পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসের মধ্যে। রাজা যখন অরণ্য শবরদের কথা মুকুন্দকে বলেন—

"তবে বন ছাড়া ওরা বাঁচতে পারে না। এই আরড়া দিনে দিনে আরও বড় হবে, বন কাটা পড়বে, দেখবেন ওরা বসত তুলে দিয়ে চলে গেছে। ... আবার কোনও অরণ্যভূমে। এই শিলাবতী, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা নদী, ব্রাহ্মণভূমি, বরাভূম, মানভূম, মল্লভূম, যেখানে অরণ্য, সেখানে শবর।'' [৭৭]

অর্থাৎ রাজার কথার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে, অরণ্যই হল শবরদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। সময়ের সাথে সাথে সমাজ জীবনের যেমন পরিবর্তন ঘটে, সমাজের পটভূমিতে থাকে সেই পুরোনো ধারা আর নতুন ধারার সংমিশ্রণ, সেই পটে শবরদের

জীবনের কোনো পরিবর্তনই ঘটে না। কারণ তারা কখনোই নাগরিক জীবনের সংস্পর্শে আসতে চায় না, এক ধরনের প্রাচীন সংস্কারে তারা বাঁধা পড়ে আছে। উপন্যাসেই এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে— *"এ ঘোর কলি যুগে, পৃথিবী যখন মানুষের পাপে পরিপূর্ণ, তখনো শবর সমাজ প্রাচীন সামাজিক অনুশাসন মেনে চলে।"*[৭৮]

জীবনে বেঁচে থাকার মূল কৌশল তাদের জানা নেই বলেই খুব সহজেই তাদের কাছ থেকে বসবাসের ভূমি চলে যায়। কারন তারা যে বন-জঙ্গল-এ বসবাস করে কৃষির প্রয়োজনে, তা শহরায়তন বৃদ্ধির ফলে তারা সেই ভূমি থেকে উৎখাত হয়ে পড়ে। এই অরণ্যই তাদের অন্ন-সংস্থানের জোগান দেয়। তারা অরণ্য থেকেই মধু, পশুর চামড়া, শিং, মাংস ইত্যাদি হাটে বিক্রি করে প্রয়োজনীয় চাল, লবণ ইত্যাদি ক্রয় করে। তাদের কাছে আত্মার সঙ্গে জড়িত এই অরণ্য প্রকৃতি। এই অরণ্য প্রকৃতিকে তারা নিজের বলেই জানে এবং এই অরণ্যেই থাকতে চায় আজীবন ধরে। কারন অরণ্য তাদের মা, তারা অরণ্য মায়ের সন্তান। তাই তারা অরণ্যের কোলেই থাকতে চায়। অরণ্যই তাদের প্রথম ও শেষ আশ্রয় স্থল। তাই মুকুন্দ মনের অদৃশ্য কলমে লেখেন—

"পুরাকালে ছিল এক আদিগন্ত বিজুবন। সেখানে থাকত শুধু অরণ্য প্রাণী। আর ছিল শবরেরা, যারা আখেটিয়া, যারা ব্যাধ। তাদের দেবী অভয়াচণ্ডী। অভয় দেন তিনি, তাঁর অরণ্যপ্রাণী, গাছ, অরণ্য সন্তান শবরদের কোল আঁচলে রাখেন।" [৭৯]

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর উপন্যাসের মধ্যে মুকুন্দের জীবনের দুঃসহ জীবনচর্যার ইতিহাস, কাল্যা-ফুলির জীবনের বারোমাসের বিস্তৃত ঘটনা সবটাই মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এর আধারে গড়ে তুলেছেন। তাঁদের সাংসারিক জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনি 'চণ্ডীমঙ্গলের' কালকেতু ও ফুল্লরার সাংসারিক জীবনের ঘটনাকেই মনে করিয়ে দেয়। লেখিকা 'চণ্ডীমঙ্গলের' উপাদানের যথাযোগ্য ব্যবহার করেছেন তাঁর 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসের মধ্যে। অর্থাৎ তাঁর 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসটি মধ্যযুগের এক নব আখ্যান হয়ে উঠেছে।

সময়ের সাথে সাথে কাল্যার জীবনেও উত্তরণ ঘটে। সে তাদের সমাজের হাল ধরে। তাই সে শিকারে যাওয়ার কথা বললে ডঙ্ক শবর আনন্দিত হয়ে ওঠে। কারন কাল্যাকে সমাজের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তাকে সমাজের 'মাথা' হিসেবে পরিণত করতে হবে বিদ্যা দিয়েই—

"ডঙ্ক ভুরু কুঁচকে বলে, মন বলে ঐরাবতের কাল ঘনিয়েছে। দেখো। মারবে একা কাল্যা, শবররা সাং (সঙ্গ) দিবে। এ কাজ না করলে কাল্যা ধাতস্থ হবে না। দেখো। তোমার কথা শুনে আমি তেল-খড়ি করে অনেক গনেছি। ওর সময়লগ্ন দেখে হাতে কাঁড়বাঁশ আমি ধরাই। এখন মনে জানছি কাল্যাকে ধাতস্থ করতে হবে। ওকে বিদ্যা নিতে হবে।'' [৮০]

কাল্যা জানে হাতিকে শিকার করা এক মরণপণ লড়াই। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায় যে, শেষ পর্যন্ত হাতির আঘাতে কাল্যার করুণ মৃত্যু ঘটে। কিন্তু কাল্যার মৃত্যুতে শবররা শেষ হয়ে যায়নি, কারন জীবন থেকে যায়। কাল্যার মৃত্যু নেই, নতুন কাল্যা জন্ম নেবে। কাল্যা স্বপ্নের নায়ক ভবিষ্যৎ জাতির কর্ণধার হিসাবে সে অধিষ্ঠিত। তাই শবররা নতুন অরণ্যের সন্ধানে আরড়া গ্রাম ত্যাগ করে আরোও গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে। এই পর্বে ডঙ্কই ওদের পথ প্রদর্শক। ঔপন্যাসিক চমৎকারভাবে এই দৃশ্যটিকে তুলে ধরেছেন আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে—

"শবরদের সত্বর আরড়ানগরীর দূরপ্রান্ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। যেমন শবররা যায় চিরকাল, চিরকাল। আর শবর জীবনের এ দেশান্তরী পর্বে ডঙ্ককেই নেতৃত্ব দিতে হবে একা তেজটা পারবেনা। মল্লভূম, ধলভূম, বরাভূম, মানভূম কোথাও অন্য এক কুমারী অরণ্য নিশ্চয় রেখেছে অভয়া। নিশ্চয় এমন জায়গা আছে। যেখানে নগর নেই, বাজার নেই, রাজা নেই, আনজাতি নেই। আছে শুধু অরণ্য, জল পাহাড়।'' [৮১]

অর্থাৎ এই পাহাড়, অরণ্য, জল বেষ্টিত এমন এক জায়গার অনুসন্ধান করে, যেখানে কোনো রাজা, নগর বা আনজাতি কেউ থাকবে না। সেখানেই তারা নতুন

করে আবার জীবন শুরু করবে— আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে এই দিকটির স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রকাশ পেয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবী আলোচ্য উপন্যাসে দেখিয়েছেন যে, মানুষ যেমন ইতিহাসের স্রষ্টা, কিন্তু সেই ইতিহাসই তো পূর্বনির্ধারিত সময়ের প্রেক্ষিতে রচিত। বর্ণাশ্রম প্রথার বাইরে তাদের বিশ্বাস, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, দেবোপাসনা সবই ভিন্ন প্রকার। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের চাপে বিপর্যস্ত করে তুলেছে তাদের স্বপ্ন ও অস্তিত্বের জগৎকে। এই স্বপ্ন ও অস্তিত্ব রক্ষার করুণ কাহিনিই বর্ণিত হয়েছে মধ্যযুগীয় আধারে মহাশ্বেতা দেবীর কলমে 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসে। তাই উপন্যাসে লক্ষ করা যায় যে, কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনিকে রূপায়ণ করতে গিয়েই তো কবি বহু পথ হেঁটেছেন। এই পথ ধরেই তিনি পেয়েছেন কালকেতু ও ফুল্লরাকে। যাদের নিয়ে তিনি 'অভয়াপাঞ্চালী' রচনা করবেন। যাদের যুগ-যুগান্তর ধরে বাঁচিয়ে রাখবেন। তাই কবি বলেন—

"কালকেতু আর ফুল্লরাকে জানবে সবাই, তোরা জিয়ে থাকবি।"[৮২]

এভাবেই মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসের মধ্যে মধ্যযুগের কবি মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের আধারে আধুনিক যুগে রচিত 'ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসের নবরূপায়ণ ঘটালেন।

তথ্যসূত্র

(১) মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, 'বাংলা কথা সাহিত্য জিজ্ঞাসা', প্রকাশক-শুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৪, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-৯

(২) সামন্ত, সুবল, (সম্পাদনা), বাংলা উপন্যাস : বীক্ষা ও অন্বীক্ষা', 'দেবেশ রায় : উপন্যাস ভাবনা', প্রকাশক-সুবল সামন্ত এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৯০, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২৫

(৩) পূর্বোক্ত, 'মহাশ্বেতা দেবী : উপন্যাস ভাবনা', বাংলা উপন্যাস : বীক্ষা ও অন্বীক্ষা', পৃষ্ঠা-১৯

(৪) দেবী, মহাশ্বেতা, ভূমিকা : অগ্নিগর্ভ, দ্র: মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র, খণ্ড-৮, প্রকাশক-সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ- এপ্রিল-২০০৩, পৃষ্ঠা-৩২৫

(৫) ঘোষ, নির্মল, 'মহাশ্বেতা দেবী : অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ', প্রকাশক-শ্রী বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশী, প্রথম প্রকাশ-বইমেলা-১৯৯৮, কলিকাতা-৯, পৃষ্ঠা-৮৭

(৬) পূর্বোক্ত, মহাশ্বেতা দেবী : অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ', পৃষ্ঠা-৭১।

(৭) ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'উপন্যাসের ভিন্নপাঠ', প্রকাশক- দেবাশিস ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ-১৪১২, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা-৯৯-১০০

(৮) দেবী, মহাশ্বেতা, 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', প্রকাশক-বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ : আশ্বিন, ১৪১০, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা-ভূমিকা অংশ

(৯) পূর্বোক্ত, 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', পৃষ্ঠা- ভূমিকা অংশ

(১০) পূর্বোক্ত, 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', পৃষ্ঠা- ২৯

(১১) পূর্বোক্ত, 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', পৃষ্ঠা- ৩০

(১২) মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, 'কালের প্রতিমা : বাংলা উপন্যাসের পঁচাওর

বছর : ১৯২৩-১৯৯৭, প্রকাশক-সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, পঞ্চম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী-২০১৪, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা-১৯৪

(১৩) পূর্বোক্ত, 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', পৃষ্ঠা-১১১

(১৪) দেবী, মহাশ্বেতা, 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', খণ্ড-৬, প্রকাশক-সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ-নভেম্বর-২০০২, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-৪৯০

(১৫) পূর্বোক্ত 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির 'জীবন ও মৃত্যু', পৃষ্ঠা- ভূমিকা অংশ

(১৬) পূর্বোক্ত 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির 'জীবন ও মৃত্যু', পৃষ্ঠা- ৯৩

(১৭) বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা, 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান', প্রকাশক-দেবাশিস ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ-২০০৫, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা-২৯৫

(১৮) চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত, (সম্পাদিত) 'বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন বাংলা উপন্যাস', 'সুদেষ্ণা চক্রবর্তী : নিম্নবর্গের উত্তরণের প্রচেষ্টা বাংলার মধ্যযুগ ও মহাশ্বেতা দেবী', প্রকাশক-সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ-২০০২, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-২৯৪

(১৯) পূর্বোক্ত, 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', পৃষ্ঠা- ৯৪

(২০) পূর্বোক্ত, 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', পৃষ্ঠা- ৯৪

(২১) পূর্বোক্ত, 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', পৃষ্ঠা- ১০৮

(২২) পূর্বোক্ত, 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', পৃষ্ঠা- ১০৮

(২৩) পূর্বোক্ত, 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', পৃষ্ঠা- ১১০

(২৪) পূর্বোক্ত, 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', পৃষ্ঠা- ১১৩

(২৫) পূর্বোক্ত, 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', পৃষ্ঠা- ১৬৭

(২৬) পূর্বোক্ত, 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', পৃষ্ঠা- ভূমিকা অংশ

(২৭) দেবী, মহাশ্বেতা, 'বিবেক বিদায় পালা', 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র' খণ্ড-১২, প্রকাশক-সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০১৪, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-১৫

(২৮) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-১৭

(২৯) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-১৯

(৩০) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-২১

(৩১) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-২৯

(৩২) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-২০

(৩৩) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-৩০

(৩৪) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-৮৯

(৩৫) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-৯০

(৩৬) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-৯৭

(৩৭) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-১০০

(৩৮) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-২৩

(৩৯) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-২৩

(৪০) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-৫৮

(৪১) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-৩০

(৪২) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-৩৬

(৪৩) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-৪১

(৪৪) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-৪১

(৪৫) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-৫১

(৪৬) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-৫৫

(৪৭) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-৪৪

(৪৮) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-৭৮

(৪৯) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-৭২

(৫০) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-৭৬-৭৭

(৫১) পূর্বোক্ত, 'বিবেক বিদায় পালা', দ্র: 'মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র', পৃষ্ঠা-১০১

(৫২) দেবী, মহাশ্বেতা, 'বেনেবউ', প্রকাশক- বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ- এপ্রিল-২০১০, কলিকাতা-০৯, পৃষ্ঠা-ভূমিকা অংশ

(৫৩) পূর্বোক্ত 'বেনেবউ', পৃষ্ঠা- ভূমিকা অংশ

(৫৪) ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'উপন্যাসের ভিন্নপাঠ' প্রকাশক- দেবাশিস ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ-১৪১২, কলকাতা-০৯, পৃষ্ঠা- ৮৯

(৫৫) ''দেবী, মহাশ্বেতা, 'বেনেবউ' প্রকাশক-বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল-২০১০, কলিকাতা-০৯, পৃষ্ঠা-৭

(৫৬) পূর্বোক্ত 'বেনেবউ' পৃষ্ঠা- ১৪

(৫৭) পূর্বোক্ত 'বেনেবউ' পৃষ্ঠা- ১৪

(৫৮) পূর্বোক্ত 'বেনেবউ' পৃষ্ঠা- ১৫

(৫৯) পূর্বোক্ত 'বেনেবউ' পৃষ্ঠা- ৭২-৭৩

(৬০) পূর্বোক্ত 'বেনেবউ' পৃষ্ঠা- ১৯

(৬১) পূর্বোক্ত 'বেনেবউ' পৃষ্ঠা- ১৯

(৬২) পূর্বোক্ত 'বেনেবউ' পৃষ্ঠা- ৩৬

(৬৩) পূর্বোক্ত 'বেনেবউ' পৃষ্ঠা- ৪৬

(৬৪) পূর্বোক্ত 'বেনেবউ' পৃষ্ঠা- ১২৩

(৬৫) পূর্বোক্ত 'বেনেবউ' পৃষ্ঠা- ১৩৫

(৬৬) দেবী, মহাশ্বেতা, 'ব্যাধখণ্ড', প্রকাশক- সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৪, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা- ৭

(৬৭) পূর্বোক্ত, 'ব্যাধখণ্ড'- পৃষ্ঠা- ৮

(৬৮) পূর্বোক্ত, 'ব্যাধখণ্ড'- পৃষ্ঠা- ৯

(৬৯) পূর্বোক্ত, 'ব্যাধখণ্ড'- পৃষ্ঠা- ১১

(৭০) পূর্বোক্ত, 'ব্যাধখণ্ড'- পৃষ্ঠা- ১৬

(৭১) পূর্বোক্ত, 'ব্যাধখণ্ড'- পৃষ্ঠা- ৪৬

(৭২) পূর্বোক্ত, 'ব্যাধখণ্ড'- পৃষ্ঠা-৪৫

(৭৩) পূর্বোক্ত, ‘ব্যাধখণ্ড’- পৃষ্ঠা- ৫০

(৭৪) পূর্বোক্ত, ‘ব্যাধখণ্ড’- পৃষ্ঠা- ৫০

(৭৫) পূর্বোক্ত, ‘ব্যাধখণ্ড’- পৃষ্ঠা- ৯৩

(৭৬) পূর্বোক্ত, ‘ব্যাধখণ্ড’- পৃষ্ঠা- ৪৮

(৭৭) পূর্বোক্ত, ‘ব্যাধখণ্ড’- পৃষ্ঠা- ৫২

(৭৮) পূর্বোক্ত, ‘ব্যাধখণ্ড’- পৃষ্ঠা- ৭৭

(৭৯) পূর্বোক্ত, ‘ব্যাধখণ্ড’- পৃষ্ঠা- ৫৬-৫৭

(৮০) পূর্বোক্ত, ‘ব্যাধখণ্ড’- পৃষ্ঠা- ১০৮

(৮১) পূর্বোক্ত, ‘ব্যাধখণ্ড’- পৃষ্ঠা- ১১৭

(৮২) পূর্বোক্ত, ‘ব্যাধখণ্ড’- পৃষ্ঠা- ১২০